আবার যুদ্ধ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীকানাই পাল

আবার যুদ্ধ

শহরতলির এই শেষ দিকটা অনেকখানিই ফাঁকা ফাঁকা। এখানে প্রচুর গাছপালা, ঝোপঝাড়, জংলা মাঠ। সেই তুলনায় বাড়িঘর কম। যেগুলো রয়েছে তার বেশির ভাগই সেকেলে। তবে কলকাতা যেভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, নিজেকে বাড়িয়ে চলছে অবিরল, তার ছোঁয়া এসে লেগেছে এই এলাকাতেও। বেশ কিছু ঝাঁ-চকচকে বাড়ি তৈরি হয়েছে। আদ্যিকালের নোনাধরা, ছাতাপড়া ইমারত ভেঙে নতুন নতুন হাই-রাইজ মাথা তুলবে, তারও তোড়জোড় চলছে পুরোদমে।

ক্যালেন্ডারের হিসেবে শীত পড়তে আরও কিছুদিন বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই হাওয়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো হিম মিশতে শুরু করেছে। সকালের দিকে বেশ খানিকটা সময় রীতিমতো ঠান্ডা লাগে। ওধারে বিকেল ফুরোতে না-ফুরোতেই তাপাঙ্ক নেমে যায় ঝপ করে। কলকারখানা নেই ধারেকাছে, গাড়িটাড়ির ভিড়ও তেমন চোখে পড়ে না। ধুলোবালি কম, পোড়া গ্যাসোলিনের ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে থাকে না চারপাশ। বাতাস এখানে টাটকা, ঝরঝরে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার; কেউ যেন ধুয়েমুছে ফিটফাট করে রেখেছে।

এখন সকাল, তবে রোদ ওঠে নি। আকাশ যেখানে শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে বহুদূরে নেমে গেছে সেখানে সূর্যটা উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করে নি, কিন্তু আলো ফুটেছে। মৃদু নরম স্নিগ্ধ আলো। এই সময়টা এখানে হালকা কুয়াশা পড়ে। পুরো দিগন্ত জুড়ে সিল্কের ধবধবে মিহি ঝালরের মতো সেটা এই মুহূর্তে আটকে আছে। রোদ উঠলে লহমায় তা মিলিয়ে যাবে।

এলাকাটার নাম রাজানগর।

একটা পুরনো, মজবুত, থামওলা বাড়ির দোতলায় জানালার ধার ঘেঁষে মেহগনি কাঠের মস্ত খাটে শুয়ে ছিলেন সত্যবান দত্তচৌধুরি। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন মেজর। এই এলাকায় তিনি কারও কাকু, কারও জেঠু, কারও দাদা। সমবয়সীরা অবশ্য নাম ধরে ডাকে। গায়ে সামরিক ছাপ থাকায় কেউ কেউ অবশ্য মেজর সাহেবও বলে।

ঘরের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমোতে পারেন না সত্যবান। মনে হয় দম আটকে আসছে। শিয়রের দিকের জানালার একটা পাল্লা তাই খোলা থাকে। ভেতর দিকের দরজায় তিনি খিল লাগান না, সেটা ভেজিয়ে রাখেন।

অন্য দিন খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আলোর আভা চোখে এসে লাগলেই চট করে উঠে পড়েন সত্যবান। মিলিটারি ডিসিপ্লিন অর্থাৎ সামরিক শৃঙ্খলায় তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। খাওয়া শোওয়া ঘুম—সমস্ত কিছু। কয়েক বছর হল অবসর নিয়েছেন, কচিৎ কখনও নিয়মের হেরফের ঘটে নি। কিন্তু কাল রাত্তিরে অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড নিয়ে একটা বই পড়তে পড়তে মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছিল। ঘুমোতে ঘুমোতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই আলো ফুটলেও ঘুম ভাঙেনি।

ভেজানো দরজা ঠেলে লক্ষ্মী ঘরে ঢুকল। ভয়ে ভয়ে ডাকল, 'বাবা—'

লক্ষ্মীর বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। শক্তপোক্ত, কেজো চেহারা। রং কালো। হাত-পায়ের হাড় মোটা মোটা। চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। তবু এই বয়সেও মুখখানা ভারি মিষ্টি, ঢলঢলে। এর মধ্যেই স্নান হয়ে গেছে তার। পরনে পরিষ্কার কাচা শাড়ি। কপালে এবং সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর। হাতে শাঁখা এবং নোয়া।

লক্ষ্মী এ-বাড়ির কেউ নয়, আবার অনেক কিছুই। সত্যবান প্রায়ই তাঁকে বলেন, 'তোর মা-বাপ তোকে ভুল নাম দিয়েছে। তোর নাম হওয়া উচিত ছিল মা দুর্গা—দশভুজা।' ঠিকই বলেন। দশ হাতে সত্যবানের সংসারটা আগলে রেখেছে সে।

একদা লক্ষ্মীর একটা বিয়েও হয়েছিল। স্বামী হরেন রিকশা চালাত। এমন হাড়বজ্জাত, রগচটা, মদোমাতালের জুড়ি ভূ-ভারতে পাওয়া যাবে না। তার ওপর ছিল মেয়েমানুষের দোষ। নেশা একবার মাথায় চড়লে হিতাহিত জ্ঞান থাকত না, লক্ষ্মীকে বেদম পেটাতে থাকত। তবু মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছিল লক্ষ্মী। কেননা বিয়ের দেড় বছরের মাথায় তার একটা ছেলে হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ অব্দি স্বামীর ঘর করা আর সম্ভব হল না। একদিন অন্য একটা রিকশাওলার বউকে ভাগিয়ে নিয়ে তল্লাট ছেড়ে উধাও হল হরেন। আর অথই সমুদ্রে গিয়ে পড়ল লক্ষ্মী।

লক্ষ্মীর মা মরেছিল যখন তার বয়স সবে নয়। তার বিয়ে দেবার পর পরই সাতদিনের জ্বরে বাপ মরল। একটা ভাই ছিল। সে পাঞ্জাবে না কোথায় যেন কাজের খোঁজে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি। লক্ষ্মী ছেলে নাটুকে নিয়ে কার কাছে যাবে, কী খাবে, কোথায় মাথা গোঁজার নিরাপদ জায়গা পাবে, ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছিল না। একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল সে। তা ছাড়া তখন তার বয়স কম, দেখতে শুনতেও ভাল। কিন্তু অরক্ষিত যুবতী মেয়ে,

মাথার ওপর আগলে রাখার মতো কেউ নেই। তাক বুঝে শেয়াল-শকুনেরা তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য দাঁত নখ মেলতে শুরু করেছিল। কিভাবে জানতে পেরে সত্যবান দত্তচৌধুরি লক্ষ্মীদের নিজের কাছে গিয়ে আসেন। তারপর থেকে ওরা এই পরিবারেই পার্মানেন্ট মেম্বার—স্থায়ী সদস্য। লক্ষ্মীরা যখন আসে, নাটু তখন আট বছরের বালক, এখন সে পনেরো বছরের টগবগে কিশোর। সত্যবান নাটুকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন।

এরকম কুড়নো বাড়ানো আরও কয়েকজন রয়েছে এ-বাড়িতে। এদের নিয়েই তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। অবশ্য এমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাড়ির বাইরেও তাঁর অনেক রয়েছে। কিন্তু সে-সব কথা পরে।

এ-বাড়িতে নিয়ে আসার পর থেকেই লক্ষ্মীর ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়েছে সত্যবানের। যে বিবাহিত জীবন কবেই পুড়ে ঝুড়ে শেষ হয়ে গেছে, শাঁখাসিঁদুর পরে এতকাল বাদেও তার স্মৃতি জীইয়ে রাখার কী যে মানে, কে জানে। মানুষের মনে কত ধরনের গোলকধাঁধা যে লুকনো থাকে! মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেন না তিনি।

আগের বার ডাকটা শুনতে পান নি সত্যবান। লক্ষ্মী ফের ডাকে, 'বাবা--বাবা—'

এবার কাজ হল। ধড়মড় করে উঠে বসলেন সত্যবান। চকিতে জানালার বাইরে তাকিয়ে বললেন, 'ইস, রোদ উঠতে চলল। আগে ডাকিস নি কেন?'

লক্ষ্মী বলল, 'দু'বার এসে দেকে গেচি। অসাড়ে ঘুমুচ্ছেলেন। ভাবলাম শরীল খারাপ। তাই—' কত বছর এ-বাড়িতে কেটে গেল তবু এখনও তার কথায় রীতিমতো গেঁয়ো টান।

চোখ পাকিয়ে, গমগমে গলায় কিন্তু মজার সুরে সত্যবান বললেন, 'সাত বছর এখানে আছিস। কখনও আমার শরীর খারাপ হতে দেখেছিস?'

কথাটা শতকরা একশো ভাগ ঠিক। ন'মাসে ছ'মাসে একটু আধটু সর্দিকাশি বা জ্বরজারি যে হয় না তা নয়। কিন্তু ভারী অসুখ বিসুখে সত্যবান দু'চার সপ্তাহ শয্যাশায়ী হয়ে আছেন, এমন দৃশ্য লক্ষ্মীর চোখে পড়ে নি। মুখ নিচু করে ঠোঁট টিপে সে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাইরে অনেকগুলো সাইকেলের ঘণ্টি ঘন ঘন বেজে চলেছে। বোঝাই যায় যিশু তপু রজতরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কখন এসেছে?'

লক্ষ্মী বলল, 'খানিক্ষণ—'

আর বসে থাকার সময় নেই। পরশু রাতে একটা অচেনা লোক ফোন করে গোলমেলে খবর দিয়েছিল। বার বার বলা সত্ত্বেও সে তার পরিচয় জানায় নি। কাল জরুরি কিছু কাজ ছিল। তাই সত্যবান ঠিক করে রেখেছিলেন খবরটা আদৌ সঠিক কিনা, আজ সকালে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসবেন। সেইমতো রজতদের জানিয়েও দিয়েছিলেন। অবশ্য না জানালেও চলত। রোজ সকালে তাঁরা একসঙ্গে সাইকেলে চক্কর দিতে বেরোন।

রজতরা ঠিক পৌঁছে গেছে। আর আজই কিনা সত্যবানের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল! সময় এবং নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে তাঁর দারুণ গর্ব, সেটা তিনি জাহিরও করে থাকেন। আজ তাঁকে রজতদের চোখা চোখা বাক্যবাণ হজম করতে হবে।

খাট থেকে নেমে সোজা বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে সত্যবান লক্ষ্মীকে বললেন, 'ওদের আরেকটু দাঁড়াতে বল। আমি পাঁচ মিনিটের ভেতর যাচ্ছি।'

লক্ষ করলে দেখা যাবে, একটু খুঁড়িয়ে, ঠিক খুঁড়িয়ে নয়, সামান্য পা টেনে টেনে হাঁটেন সত্যবান। কার্গিল যুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের তিন তিনটে বুলেট তাঁর উরু ভেদ করে বেরিয়ে যায়। পা'টাই হয়তো কেটে বাদ দিতে হতো। ডাক্তাররা বেশ ক'টা অপারেশনের পর সেটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। যে- খুঁতটুকু রয়ে গেছে তা সত্যবানের ফৌজি জীবনের চিরস্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন। এটা নিয়ে তাঁর বিরাট গর্ব।

লক্ষ্মী চলে গেল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে চটপট পোশাক পালটে ফেললেন সত্যবান। বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন জাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠান বাদ দিলে শ্যাওলা রঙের ঢোলা খাকি ফুল প্যান্ট আর দুই পকেটওলা খাকি শার্ট পরে বাইরে বেরোন। সামরিক জীবন সারাক্ষণ তাঁর চলাফেরায়, পোশাক আশাকে, কথায় বার্তায়, ছোটখাটো নানা অভ্যাসে, এমনকি শ্বাসপ্রশ্বাসেও জড়িয়ে থাকে।

সত্যবান ড্রেসিং টেবলের সামনে চলে এসেছিলেন। ক্ষিপ্র হাতে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বাঁ ধারের একটা বুক-কেসের ওপর পেতলের ফ্রেমে-বাঁধানো চারটে ফোটোর দিকে চোখ চলে গেল। সবগুলোই দশ ইঞ্চির মতো খাড়াই।

একটা ফোটোতে হাস্যোজ্জ্বল এক নারীর মুখ। তাঁর স্ত্রী চারুলতা। সত্যবানের স্পষ্ট মনে আছে, চারুলতার বয়স যখন তিরিশ, এই ছবিটা তোলা হয়েছিল। তখন তিনি পরিপূর্ণ যুবতী। গলানো গিনির মতো গায়ের রং। মিহি রেশমের সুতোর মতো ঘন চুল। ভরাট গলা। সরু ভুরু। ঘন পালকে-ঘেরা, ভাসা ভাসা চোখের দৃষ্টি গভীর এবং আশ্চর্য মায়ায় ভরা। কপালে সিঁদুরের মস্ত টিপ। নাকে

হিরের নাকছাবি, গলায় লকেটওলা সোনার দড়ি হার। এমন নিষ্পাপ মুখ ক্বচিৎ চোখে পড়ে।

ছবিটা এতই জীবন্ত, মনে হয়, চারুলতা এখনই কথা বলে উঠবেন। ঠোঁট টিপে বলবেন, 'কী করে চুল যে আঁচড়াচ্ছ! একদিকে যে খাড়া খাড়া হয়ে রইল।'

মনে পড়ে, কখনও গলা উঁচুতে তুলে কথা বলতেন না চারুলতা। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মৃদু, সুরেলা। ক'বছর হল, সত্যবানের জীবনের অনেকটা অংশ ফাঁকা করে দিয়ে চলে গেছেন। ওই ফোটোটা ছাড়াও সাত আটটা অ্যালবাম বোঝাই অগুনতি ছবি আর সত্যবানের স্মৃতির মধ্যে তিনি বেঁচে আছেন।

ফোটোটা ঘিরে জুঁই ফুলের বাসি মালা জড়ানো। একটু বেলার দিকে রোজ একটা লোক ফুল মালা টালা বেচতে আসে। লক্ষ্মীকে বলা আছে, পুরনো মিয়ানো মালা ফেলে টাটকা মালা কিনে ফোটোটা সাজিয়ে যেন রাখে। এতদিন এ-বাড়িতে আছে মেয়েটা। দ্বিতীয় বার তাকে কথাটা মনে করিয়ে দিতে হয়নি।

চারুলতার ফোটোর পাশের ফোটোটা রাহুলের, তার পরেরটা কাবেরীর। একেবারে শেষ ফোটোটা রিন্টি আর সানির। রাহুল আর কাবেরী সত্যবানের ছেলে এবং মেয়ে। রিন্টি আর সানি তাঁর নাতি-নাতনি। রিন্টি রাহুলের মেয়ে, সানি কাবেরীর ছেলে।

রাহুলরা সবাই বেঁচে আছে। তাই ওদের ছবিতে আর মালা পরানো হয় না। জীবিত থাকলেও সত্যবানের জীবন থেকে তারা প্রায় মুছে গেছে। রাহুল থাকে আমেরিকায়, কাবেরী কানাডায়। কাবেরী তবু মাঝে মধ্যে ফোন করে সত্যবানের খবর নেয়। রাহুল শেষ করে ফোন করেছিল, মনে পড়ে না। ওদের ফোটোগুলো স্মৃতিফলকের মতো বুক-কেসের মাথায় পড়ে থাকে। রাহুল শেষ রাজানগরে এসেছিল বছর চারেক আগে। কাবেরীর শেষ আসা আরও কিছুদিন পর, তাও আড়াই বছর হয়ে গেল। ফের কবে ওরা আসবে, আদৌ আসবে কিনা, কে জানে। তবে ছেলে এবং মেয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর প্রথম প্রথম ঘন ঘন ফোন করত। বলত, রাজানগরে একা একা সত্যবানের পড়ে থাকার মানে হয় না। ওদের ইচ্ছা ছিল, এখানকার বাড়ি টাড়ি বেচে তিনি বিদেশে চলে যান। পালা করে ছ'মাস ছেলের কাছে আমেরিকায়, ছ'মাস মেয়ের কাছে কানাডায়, এইভাবে দুই মহাদেশে, বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিন। একা ঝাড়া হাত-পা মানুষ। চলে যাওয়াটা কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু রাজানগরে নানা দিক থেকে আগাপাশতলা এমন জড়িয়ে গেছেন যে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি।

স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। চুল আঁচড়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পেছন থেকে লক্ষ্মীর গলা কানে এল, 'বাবা, আপনার চা—'

মেয়েটা আবার ফিরে এসেছে।

আজই শুধু নয়, রোজ ভোরে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে চক্কর দিতে বেরোন সত্যবান। বেরুবার আগে এক কাপ চা খান। লক্ষ্মীকে সেরকমই বলা আছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে পোশাক বদলানো শেষ হতে না-হতেই লক্ষ্মী চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হয়ে যায়। সে এ-বাড়িতে আসার পর শীতগ্রীষ্ম বারো মাস এই রুটিনে একদিনের জন্যও এদিক ওদিক হয়নি।

বার দুই এলোপাতাড়ি চিরুনি টেনে ঘুরে দাঁড়ালেন সত্যবান। যথারীতি একটা ছোট ট্রেতে খানকতক বিস্কুট আর চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মী।

ভুরু কুঁচকে গেল সত্যবানের। একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, 'আজ উঠতে দেরি হয়ে গেছে। আবার চা করতে গেলি কেন?' নিয়ম বা শৃঙ্খলা ভাঙাটা যে অন্যায়, চেনাজানা সবাইকে এই সারবাক্যটি তিনি বার বার মনে করিয়ে দেন। কিন্তু এখন খেয়াল রইল না, লক্ষ্মীকে ভোরে চা দেবার কথাটা অনেক কাল আগেই বলে রেখেছিলেন। অন্যদিনের মতো সে তাঁর হুকুমটা তামিল করেছে মাত্র।

লক্ষ্মী জবাব দিল না।

সত্যবান এবার বললেন, 'এখন সময় নেই। ওসব নিয়ে যা।'

লক্ষ্মী কিন্তু চলে গেল না। বড় বড়, শান্ত চোখে তাকিয়ে রইল পলকহীন।

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলেন সত্যবান। কোনও কিছু মনঃপূত না হলে ওইভাবে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে লক্ষ্মী। ওর নীরবতার মধ্যে এমন এক জেদ, নাকি জোর রয়েছে যা অমান্য করা যায় না।

ভুরু কুঁচকে সত্যবান বললেন, 'ডিসগাস্টিং—জ্বালাতন।' বলেই ট্রে থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুকের পর চুমুক দিতে লাগলেন। আগুন আগুন চা। জিভ যেন পুড়ে যাচ্ছে।

চা খাওয়া লক্ষ করতে করতে লক্ষ্মী এবার নিচু গলায় বলল, 'আজ কিন্তুন বাজার করতি হবে। সাইকেলের বাস্কে (বাক্সে) থলে রেকে দিইচি।'

সোম বুধ আর শুক্র—সপ্তাহে তিনদিন বাজার করেন সত্যবান। 'ঠিক আছে' বলে চায়ের কাপটা ট্রেতে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাটুরা উঠেছে?' নাটু লক্ষ্মীর ছেলে, তা ছাড়া অন্য যাদের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছেন তাদের সম্বন্ধে জানতে চাইলেন তিনি।

লক্ষ্মী জানে, বেশি বেলা অব্দি এ বাড়ির কেউ ঘুমোলে ভীষণ রেগে যান সত্যবান। সে গলা আরও নামিয়ে দিল, 'না, একনো (এখনও)—'

সত্যবান হুঙ্কারের সুরে বললেন, 'সব রাজা-মহারাজার বাড়ি থেকে এসেছে। ওদের টেনে তুলে দিস। না উঠলে গায়ে ঠান্ডা জল ঢেলে দিবি।'

লক্ষ্মী মাথা কাত করে জানালো, আদেশ পালন করা হবে।

সত্যবান বাইরে বেরিয়ে গেলেন। শ্বেতপাথরে বাঁধানো চওড়া বারান্দার গা ঘেঁষে একটা কাঠের র‍্যাকে সারি সারি তাঁর জুতো সাজানো। চটি, বুট, চপ্পল, নাগরা, পাম্প শু, ইত্যাদি। একজোড়া ভারী কেডস দ্রুত পরে ফিতে বেঁধে নিলেন। সকালে এটা পরেই তিনি বেরিয়ে পড়েন।

সত্যবানদের এই বাড়িটার নাম 'শান্তিনিবাস'। প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে, ইংরেজ আমলে, এটা তৈরি করিয়েছিলেন তাঁর ঠাকুরদা অবনীকান্ত দত্তচৌধুরি।

বাড়িটা দোতলা। একতলায় চারটে বেডরুম, কিচেন, খাওয়ার ঘর, মস্ত ড্রইংরুম। দোতলায় ছ'টা বেডরুম। কিচেন টিচেন নেই। দোতলার বারান্দার মতো এ-বাড়ির সব বারান্দা এবং ঘরের মেঝেতে ধবধবে শ্বেত পাথর। এত বছর হয়ে গেল পাথরের রং এতটুকু মলিন হয়নি, সেই আগের মতোই শুভ্র, ধবধবে।

প্রতিটি জানালায় দু'টো করে পাল্লা। একটা খড়খড়ি, অন্যটা রঙিন কাচের। দরজাগুলো সেগুন কাঠের, আড়াই ইঞ্চি চওড়া কপাট রীতিমতো মজবুত। একতলা থেকে মোটা মোটা থাম উঠে এসে বারান্দার একটা ধার ভেদ করে ছাদে উঠে গেছে।

'শান্তিনিবাস'-এর সামনে এবং পেছনে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা। সামনের দিকে বাগান। ফুলের খুব শখ সত্যবানের। বাগানটার যত্ন এবং দেখাশোনার জন্য একটা মালি রেখেছেন।

বাড়ির পেছনের অংশে নানারকম ফলের গাছ। পেয়ারা, বাতাবি লেবু, নারকেল, সুপুরি, কালোজাম, জামরুল, আম, কাগজি লেবু ইত্যাদি। সেখানে রয়েছে দু'টো পোড়ো ঘর, মাথায় অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। ওই দু'টোর ভেতর ডাঁই হয়ে আছে বাড়ির যাবতীয় বাতিল জিনিস। ভাঙা চেয়ার, ঘুণে-ধরা তক্তপোশ, ছেঁড়া জাজিম, জং-ধরা লোহালক্কড়, প্লাস্টিকের ফাটা বালতি, ইত্যাদি। চারদিকের কমপাউণ্ড ওয়ালের ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে একই হাইটের সিলভার পাইন।

দোতলায় একাই থাকেন সত্যবান। আর এখান ওখান থেকে কুড়িয়ে যাদের এনে যে বিচিত্র ফ্যামিলিটি তিনি তৈরি করেছেন তারা থাকে একতলায়। লক্ষ্মীর জন্য আলাদা একটা ঘর ঠিক করে দিয়েছেন। বাকি সবার জন্য আরও দু'টো ঘর।

দোতলার টানা বারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে যেখান থেকে নিচে নামার সিঁড়ি। লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলার সময় পরশু রাতের ফোনের কথাটা মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সত্যবানের। লম্বা লম্বা পা ফেলে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ফের সেটা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাপা উত্তেজনার আঁচ অনুভব করতে লাগলেন।

একতলায় নেমে সত্যবান লক্ষ করলেন, কোণের দিকের দু'টো ঘরের দরজা বন্ধ। ওই দুই ঘরে নাটুরা থাকে। লক্ষ্মী ঠিকই খবর দিয়েছে, ওরা এখনও ঘুমোচ্ছে। তবে বেশিক্ষণ এই সুখনিদ্রার আরামে ডুবে থাকা চলবে না। লক্ষ্মী এসে ওদের ঘেঁটি ধরে তুলে দেবে।

একতলার বারান্দায় একটা পিলারের গায়ে সত্যবানের সাইকেলটা ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে। তিনি বাইরে কোথাও না বেরুলে ওটা ওখানেই থাকে।

র‍্যালে কোম্পানির এই পুরনো মডেলের দু' চাকার যানটি সত্যবানের একমাত্র বাহন। রাজানগরের পনেরো কুড়ি কিলোমিটারের ভেতর কোথাও গেলে এটাই তাঁর ভরসা। আরও দূরে গেলে ট্রেন আছে, মিনি বাস আছে। ধকল এড়াতে চাইলে 'রেন্ট এ কার' কোম্পানিগুলো থেকে অ্যামবাসাডর, মারুতি কি টাটা সুমো ভাড়া পাওয়া যায়। দূরে যাওয়া ক্বচিৎ কখনও ঘটে। তখন মারুতি টারুতি কিছু একটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

সামনের বাগানের মাঝখান দিয়ে নুড়ি-ঢালা পথ সোজা গেটের সামনে গিয়ে থেমেছে। গেটটা লোহার, দু'টো পাল্লা। তার একটা এখন খোলা। সেখানে দারোয়ান বগুলা সিং টুলের ওপর ঝুঁকে বসে আছে। বয়স সত্তরের ওপারে। খাওয়াদাওয়া, স্নান আর রাতের ঘুমটুকু বাদ দিলে সারাদিন তাকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখা যায়। তার আসল নাম রঘুবীর, মহাদেও বা ওই জাতীয় কিছু একটা ছিল। কিন্তু শীর্ণ, ডিগডিগে চেহারা, এবং বকের মতো কাঠি কাঠি হাত-পায়ের জন্য তাকে রগড় করে বগুলা (হিন্দিতে বক) বলা হতো। বলতে বলতে ওটাই চিরতরে তার সঙ্গে জুড়ে গেছে। আদি নামটার কথা কারও মনে নেই।

একে তো শরীরের ওই হাল, তার ওপর শ্বাসকষ্টে বারোমাস ভোগে। বিশ পা হাঁটলে দশ মিনিট হাঁফায়। সরু লিকলিকে গলার ওপর মাথাটা সারাক্ষণই অল্প অল্প কাঁপে। সেই মাথায় সতেরো প্যাঁচের পেল্লায় পাগড়ি আঁটা। পায়ে বেঢপ বুট, হাতে মোটা লাঠি। এই চেহারা এবং হাতিয়ার নিয়ে সে চোর ডাকাতের হাত থেকে 'শান্তিনিবাস'কে রক্ষা করে চলেছে।

মেজর সত্যবান দত্তচৌধুরির মতো একজন জবরদস্ত মিলিটারি অফিসারের বাড়িতে এমন একটা দারোয়ান থাকতে পারে, ভাবাই যায় না। কিন্তু সত্যবানের বাবার আমল থেকে সে এখানে আছে। 'শান্তিনিবাস'-এর সে একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যতদিন বেঁচে আছে, বগুলা সিং বাড়ির গেট পাহারা দিয়ে যাবে।

গেটের খোলা পাল্লাটার ফাঁক দিয়ে বাইরের রাস্তায় যিশু তপুদের জটলা চোখে পড়ছে। ওদের সবার সঙ্গেই একটা করে সাইকেল। কেউ তার সাইকেলে আলতো করে বসে একটা পা রাস্তায় ঠেকিয়ে রেখেছে। কেউ বা তার সাইকেলটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। তার গুঞ্জন ভেসে আসছে।

পিলারের পাশ থেকে নিজের সাইকেলটা নিয়ে বাগানে নেমে পড়লেন সত্যবান। সেটা ঠেলতে ঠেলতে নুড়ির পথটা দিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে চললেন। লক্ষ করলেন, সাইকেলের সামনের দিকের রডের তলায় যে প্ল্যাস্টিকের চৌকো বাস্কেটটা আটকানো রয়েছে তার ভেতর তিনটে বড় বড় চটের ব্যাগ ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে লক্ষ্মী। যেদিন তিনি বাজার করেন ওইভাবেই ব্যাগগুলো আগেভাগে গুছিয়ে রেখে দেয় মেয়েটা।

নুড়ির ওপর দিয়ে চলার জন্য সাইকেলের চাকার আওয়াজ হচ্ছিল। যিশুরা মুখ ফিরিয়ে এদিকে তাকায়। তারপর হই হই করে ওঠে।

সত্যবানকে দেখে বগুলা সিং উঠে দাঁড়িয়ে ফৌজি কায়দায় স্যালুট ঠোকে। তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে রাস্তায় চলে আসেন সত্যবান।

অন্য দিন ভোরে 'শান্তিনিবাস'-এর সামনে পাঁচ ছ'জন হাজির হয়। আজ সংখ্যাটা বেশি। সবসুদ্ধ তেরো জন। এদের বেশির ভাগই কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বয়স আঠারো থেকে তেইশের ভেতর। রজত এবং অংশু অনেকটাই বড়। রজত একটা কলেজে ইংরেজির লেকচারার, অংশু ব্যাঙ্কের জুনিয়র অফিসার।

রাজানগরে রজতদের মতো সত্যবানের অজস্র কমবয়সী অন্ধ ভক্ত রয়েছে। সত্যবান একটা আঙুল তুললে তারা যে কোনও বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতে তাদের কতটা ক্ষতি হল তা নিয়ে এক মুহূর্তও মাথা ঘামাবে না। কিন্তু ভোরের

নিদ্রাটি জলাঞ্জলি দিয়ে সাত আট কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে শরীরকে তাজা রাখা, এমন মহৎ উদ্দেশ্যও তাদের সবাইকেই খুব একটা চাগিয়ে তুলতে পারে না। তবে ছ' সাত জন নিয়মিত সত্যবানের সঙ্গে সাইকেল ভ্রমণে বেরোয়। আজ সংখ্যাটা বাড়ার কারণ, পরশুর ফোনের কথা কাল অনেককেই বলে দিয়েছিলেন। তাই বাড়তি কয়েকজন চলে এসেছে।

যিশুদের গলার স্বর ক্রমশ চড়ছিল। 'এটা কিরকম হল? আপনি সতেরো মিনিট লেট—'

রজত বলল, 'পাংচুয়ালিটি নিয়ে এত গর্ব। সেই গর্বের বেলুনটা ফুটো হয়ে গেল তো?'

আরেকজন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, 'কোথায় গেল আপনার মিলিটারি ডিসিপ্লিন— অ্যাঁ?'

চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে আসছে। আত্মরক্ষার মতো মজবুত বর্ম তাঁর নেই। বোকাটে হেসে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দুই হাত ওপরে তুলে, মাথা ঝুঁকিয়ে, সত্যবান বললেন, 'আমি কোর্ট মার্শালের জন্যে প্রস্তুত। যে কোনও পানিশমেন্ট মাথা পেতে নেব। তবে আমার একটা কৈফিয়ৎ দেবার আছে। মাননীয় ধর্মাবতাররা, সেটি শোনার জন্য দয়া করে আমাকে কি এক মিনিট সময় দেবেন?' এই যুবকদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একেবারে বন্ধুর মতো।

সবাই চেঁচামেচি করে একসঙ্গে কী বলতে যাচ্ছিল, অংশু তাদের থামিয়ে দিয়ে সত্যবানকে বলল, 'ঠিক আছে, সময় দেওয়া হল। কিন্তু জাস্ট ওয়ান মিনিট। নট আ সেকেন্ড মোর—'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার—' আজ দেরি হওয়ার কারণটা জানিয়ে দিলেন সত্যবান।

'ওকে। এটা প্রথম অপরাধ। ক্ষমা করে দেওয়া হল।'

'মেনি থ্যাঙ্কস। ভবিষ্যতে এমনটা আর কখনও হবে না।'

এতক্ষণ অপরাধী অপরাধী মুখ করে, মিনমিনে গলায় কথা বলেছিলেন সত্যবান। সবটাই মজা, সবটাই আমোদ। হঠাৎ কণ্ঠস্বর পালটে সেটাকে গমগমে করে তুললেন। বললেন, 'অনেক হয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে আর সময় নষ্ট করা নয়। ওই দ্যাখ—' দূরে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

দিগন্তের তলা থেকে সূর্য সিকিভাগ উঠে এসেছে। কুয়াশার সেই মলমলটা আর নেই। নরম সোনালি রোদ ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে।

'লেট আস স্টার্ট। যে যার সাইকেলে চটপট উঠে পড়—' ফৌজি অফিসাররা যেভাবে হুকুম দেন সত্যবান সেই কায়দায় বলে উঠলেন। প্রাক্তন মেজর সাহেব নিজস্ব মহিমায় ফিরে এসেছেন।

সবাই সাইকেলে উঠে পড়েছিল। সত্যবান লক্ষ করলেন, রাস্তার উলটো দিকের বাড়িটার তেতলার একটা জানালায় রিনি, যার ভাল নাম রণিতা, আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রায় চল্লিশ ফিট উচ্চতা থেকে চোখ ছোট করে রজতের দিকে তাকিয়ে সে কিছু একটা ইঙ্গিত করল। তার মুখে হাসির আভা। এদিকে রজতের মুখেও হাসির ঝলক ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সেও চোখ কুঁচকে একটা ইশারা করল।

ক'দিন ধরেই এই দৃশ্যটা চোখে পড়ছে সত্যবানের। এমনিতে রজত একটু আলসে ধরনের, ঘুমকাতুরে। সাইকেলে চেপে সত্যবানেরা যে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোন তাতে রোজ তাকে পাওয়া যায় না। পর পর তিন দিন এল তো তারপর দু'দিন ডুব। কিন্তু সপ্তাহ দেড়েক ধরে রোজ আসছে সে, একটা দিনও বাদ নেই। ইদানীং সকালে বেড়ানোর যে চাড় তরুণ অধ্যাপকটির মধ্যে দেখা দিয়েছে তার প্রেরণা তেতলার জানালায় একটি সুন্দর মুখ। ভোরের আলোয় তাকে মায়াকাননের পরী মনে হয়।

রাজানগরের প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি বাসিন্দার নাড়িনক্ষত্র সত্যবানের হাতের মুঠোয়। তিনি জানেন, রিনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কম্পারেটিভ লিটারেচার নিয়ে এম. এ পড়ছে। এটাই ফাইনাল ইয়ার। লেখাপড়ায় দারুণ, তুড়ি মেরে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যাবে। মা বাবার একমাত্র সন্তান। ওর বাবা বিনায়ক দত্ত হাইকোর্টের বাঘা ল'ইয়ার। দুর্দান্ত পসার। মক্কেলের হয়ে আদালতে একবার দাঁড়ালে ফী কুড়ি হাজার। বলা যায়, টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছেন।

রজতের বাবা মনোতোষ লাহিড়ি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। তাঁর একটা বিশাল ফার্ম রয়েছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে। তার ক্লায়েন্টদের বেশির ভাগই বিরাট বিরাট মারোয়াড়ি এবং গুজরাটি বিজনেসম্যান। টাকার বিন্ধ্য পর্বত তিনিও বানিয়েছেন। দুই ছেলে। রজত আর সুনন্দ। রজত বড়, অ্যাকাউন্টেন্সি ফ্যাকউটেন্সির পাঁচশো মাইলের মধ্যে নেই। হিসেবপত্তর অঙ্কটঙ্ক তার মাথায় ঢোকে না। কলেজে ইংরেজি পড়িয়ে সে খুশি। মনোতোষের ইচ্ছা ছিল ছেলেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট করে নিজের ফার্মে বসিয়ে দেবেন। সেটা করা সম্ভব হয় নি। জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্পর্কে তিনি আশা ছেড়ে দিয়েছেন। বলেন, 'কুলাঙ্গার। কলেজে পড়িয়ে ক'পয়সা পাবি রে ইডিয়ট?' তবে ছোট ছেলে তাঁর লাইনেই চলেছে। বছর দুয়েকের ভেতর সেও চার্টার্ড অ্যাকউন্টেন্ট হয়ে যাবে। সুনন্দর ওপর মনোতোষের অগাধ আস্থা। তাঁর ইচ্ছাপূরণ সে-ই করতে পারবে।

রজতদেরও টাকা আছে, রিনিদেরও আছে। সামাজিক স্টেটাসও দুই ফ্যামিলির প্রায় এক। সমস্যা থাকার কথা নয়। কিন্তু সব পথেই গোলাপ

বিছানো থাকে না। ব্যাপারটা মিলনান্তক নাটকের শেষ দৃশ্যে যেমন মধুর হয়ে থাকে তাই হবে, নাকি বিষাদময় ট্র্যাজেডি হয়ে উঠবে, বলা মুশকিল।

কেননা রাজানগরের সতেরো কাঠা একটা জমি নিয়ে মনোতোষ আর বিনায়কের মধ্যে বছর দশেক ধরে মামলা চলছে। বাইরে মামলা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে চোরা বানের মতো ঢুকে গেছে এঁর ছেলে আর ওঁর মেয়ের গোপন প্রেম। বিনায়ক আর মনোতোষ দু'জনেরই ভীষণ গোঁ। পৃথিবী রসাতলে যাক, কেসে লাখ লাখ টাকা খরচ হোক, তবু জমিটা ওঁদের চাইই চাই। যেখানে দুই পরিবারে এতটা শত্রুতা, এমন বিদ্বেষ, সেখানে রজত আর রিনির সম্পর্কটা শেষ অব্দি কোথায় গিয়ে ঠেকবে, কে জানে।

রাস্তাটা সোজা পুব দিকে চলে গেছে। একসময় সত্যবানের সাইকলে ব্রিগেড সেটা ধরে চলতে শুরু করল।

একেবারে সামনের দিকে রয়েছেন সত্যবান, তাঁর দু'পাশে রজত আর পাবু। পাবুর বয়স আঠারো উনিশ। সে প্রেসিডেন্সিতে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। ভাল নাম সম্রাট। সদ্য-যুবক পাবুর প্রচণ্ড এনার্জি, সারাক্ষণ যেন টগবগ করে ফুটছে।

পেছনে লাইন দিয়ে বাকি সবাই। দু' হাতে সাইকেলের হ্যান্ডেল ধরে, সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে, সমানে প্যাডল করে যাচ্ছে। বাঁই বাঁই ঘুরে চলেছে চোদ্দ জোড়া সাইকলের চাকা। এত জোরে যে স্পোকগুলো আলাদা করে বোঝা যায় না। যেন ঘূর্ণ্যমান আটাশটা বৃত্ত।

পাশ থেকে পাবু সত্যবানকে জিজ্ঞেস করে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিছুই কিন্তু বলেন নি জেঠু।' পাবুর বাবা হিরণ্ময় দাশগুপ্ত সত্যবানকে দাদা বলেন। তাই তিনি ওর জেঠু।

পাবু যা বলল সেই প্রশ্নটা রজত অংশুরাও কাল করেছিল। সত্যবান যা জবাব দিয়েছিলেন, এখনও তাই দিলেন, 'ওয়েট কর। সব জানতে পারবি!' সেই সঙ্গে আরও একটু জুড়ে দিলেন, 'পনেরো মিনিটের ভেতর আমরা ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাব।'

দুই

এমন অনেকে আছেন যাদের মুখে বড় মনোরম মুখোশ আঁটা থাকে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় নিষ্পাপ দেবশিশু। কথায় মধু ঝরে পড়ে। দু'চারদিন মেলামেশা করতে না-করতেই টের পাওয়া যায় এরা একেকটি কালসাপ, ভেতরে হাজারটা জিলিপির প্যাঁচ। এদের তলকূল পাওয়া ভার।

কিন্তু সত্যবান দত্তচৌধুরিকে যেমনটা দেখা যায়, তিনি অবিকল তা-ই। ঋজু, অকপট। উলটোপালটা কোনও ব্যাপার নেই। মুখে যা বলেন, সেটাই করেন। মুখে একরকম, পেটে আরেক রকম, তাঁর সম্বন্ধে এটা ভাবাই যায় না।

ছ'ফিটের ওপর হাইট। গত অক্টোবরে চৌষট্টি পেরিয়েছেন। এখনও মেরুদণ্ড টান টান। চওড়া কাঁধ, ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের আধাআধি এখনও কাঁচা। চোখের দৃষ্টি সতেজ, আধ কিলোমিটার দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে পান। পড়ার সময় অবশ্য চশমা লাগে। বুকের মাপ চল্লিশ ইঞ্চির কাছাকাছি। গলার স্বর গম্ভীর, ভরাট। প্রাণখোলা, দরাজ গলায় বাতাসে ঢেউ তুলে হেসে উঠতে পারেন। এমন হাসি যিনি হাসেন তাঁর ভেতর ধুলোময়লা থাকে না।

সত্যবান দত্তচৌধুরিকে বুঝতে হলে এটুকুই যথেষ্ট নয়। তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু জানা দরকার।

চার পুরুষ রাজানগরে আছেন সত্যবানরা। এক শো বছরেরও বেশি। বর্ধমানের এক অজ পাড়াগাঁ থেকে তাঁর ঠাকুরদার বাবা সংসার তুলে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। তারপর কিভাবে কিভাবে রাজানগরে এলেন সেই ইতিহাস শুনে থাকলেও এখন আর মনে নেই সত্যবানের। সব ঝাপসা হয়ে গেছে।

মস্তিষ্কের যে গোপন কুঠুরিতে স্মৃতির অ্যালবামটা যত্ন করে রাখা আছে সেটা খুললে প্রথমেই ঠাকুরদা অবনীকান্ত দত্তচৌধুরির ছবি। দারুণ সুপুরুষ ছিলেন। শৌখিনও। মহা পণ্ডিত। পড়াতেন সংস্কৃত কলেজে। ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে রিটায়ার করেন। গরদের পাঞ্জাবি আর নকশা-পাড় দুধ-সাদা তাঁতের ধুতি ছিল তাঁর বাইরে বেরুবার পোশাক। বাড়িতেও ধুতি পরতেন, সেই সঙ্গে হাফ-হাতা ধবধবে জামা—সেটা পাঞ্জাবি আর ফতুয়ার মাঝামাঝি একটা কিছু। নিজে কাগজে নকশা এঁকে দর্জিকে দিয়ে ওটা বানিয়ে নিতেন। পায়ে চকচকে পাম্প শু বা শুঁড়তোলা বিদ্যাসাগরী চটি।

ঠাকুমাকে দেখেন নি সত্যবান। তাঁর জন্মের আগে শুধু ঠাকুমাই না, একমাত্র পিসিরও মৃত্যু হয়। সত্যবান যে-বছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিলেন, রেজাল্ট বেরুবার আগেই ঠাকুরদা চলে গেলেন।

ঠাকুরদার পর যাঁকে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তিনি বাবা। সদানন্দ দত্তচৌধুরি। সদানন্দ ছিলেন ডাক্তার। রাজানগর এবং সেটা ঘিরে যত গ্রাম আর ছোটখাটো শহর রয়েছে, সব জায়গায় হাজার হাজার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন ঈশ্বরের মতো।

বাড়িতে তাঁর রোগী দেখার চেম্বার ছিল। চেম্বারে এলে পাঁচ টাকা ফী, রোগীর বাড়িতে গেলে দশ টাকা। অবশ্য যাদের দেবার ক্ষমতা আছে তাদের কাছ থেকেই টাকা নিতেন সদানন্দ। গরিবগুরবোরা একেবারে ফ্রি। এদের বিনে পয়সায় দেখতেন। ফার্মাসসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলোর রিপ্রেজেন্টেটিভরা কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধের স্যাম্পল ডাক্তারদের দেয়। সদানন্দ অকাতরে সে-সব ওদের বিলিয়ে দিতেন। শুধু তাই না, অনেককে পথ্যের জন্য নিজের পকেট থেকে টাকাও দিতেন।

সত্যবানের মা স্বর্ণময়ী ছিলেন চিররুগ্ণ। হার্ট, কিডনি, রেটিনা, কিছুই ঠিকঠাক ছিল না। তার ওপর নার্ভের সমস্যা। বেশির ভাগ দিনই শুয়ে থাকতেন। জীবনীশক্তি এতটাই ক্ষীণ যে বাড়ির ভেতর হাঁটাচলা করতেও কষ্ট হতো। গলার স্বর উঁচুতে তুলে যে কথা বলবেন, তেমন জোরটুকুও ছিল না। বাড়িতে যে তিনি আছেন, টেরই পাওয়া যেত না।

সত্যবান মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তিনি যে-বার হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে মিলিটারি একাডেমিতে ভর্তি হলেন সে বছরই মারা যান স্বর্ণময়ী।

ট্রেনিং শেষ হলে সত্যবানকে ওয়েস্টার্ন কমান্ডে পাঠানো হয়। পুনেতে তাঁর প্রথম পোস্টিং। সেখানে টানা তিন বছর ছিলেন। এই সময়ে তাঁর জীবনে দু'টো বড় ঘটনা ঘটে। চারুলতার সঙ্গে বিয়ে এবং মায়ের মৃত্যু। মৃত্যুটা আকস্মিক কিছু নয়। এর জন্য মনে মনে সদানন্দরা অনেকদিন ধরে প্রস্তুত ছিলেন।

পুনেতে সত্যবানকে বিশাল কোয়ার্টার্স দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আরামের অঢেল উপকরণ। কিন্তু বাবাকে রাজানগরে একা রেখে স্ত্রীকে নিজের কাছে একদিনের জন্যও নিয়ে যান নি। সদানন্দ ছেলেকে বহুবার বলেছেন, রাগারাগিও করেছেন। সব মেয়েই বিয়ের পর স্বামীর কাছে থাকতে চায়। তার সাধ-আহ্লাদের কথা স্বামীকে ছাড়া অন্য কারওকে বলা সম্ভব নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য সমস্ত ব্যাপারে বাবার কথাই তাঁর কাছে শেষ কথা। তাঁর যাবতীয় হুকুম মাথা নিচু করে পালন করে যেতেন সত্যবান কিন্তু সদানন্দর এই

কথাগুলো এক কানে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দিতেন। বাবা আগোছালো, অন্যমনস্ক ধরনের মানুষ। খাওয়ার ঠিক নেই, স্নানের ঠিক নেই। রোগী নিয়ে সারাক্ষণ মেতে আছেন। স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বাড়িতে একটি মেয়ে না থাকলে কে তাঁর দেখাশোনা করবে? কে সময়মতো যত্ন করে খাওয়াবে, ঘুমোতে পাঠাবে? কাজের লোক দিয়ে এ-সব কখনও হয়?

সত্যবানের বিয়ের দু'বছরের মধ্যেই রাহুলের জন্ম। আর সেবারই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। পুনে থেকে ইস্টার্ন ফ্রন্টে পাঠানো হল তাঁকে। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশাপাশি যে ভারতীয় জওয়ানরা মরণপণ লড়াই চালিয়েছিল তিনি তাদেরই একজন। সত্যবান তখন সেনাবাহিনীর এক তরুণ অফিসার। ঢাকায় পাকিস্তানি ফৌজ যেদিন আত্মসমর্পণ করে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের তিনি সাক্ষী। ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেল তখন তাঁর বয়স তিন কি চার। দেশ অফুরান আনন্দে কতটা আত্মহারা হয়ে উঠেছিল, কিছুই তাঁর মনে নেই। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিজের চোখে দেখেছেন। এই মুক্তিযুদ্ধের তিনিও একজন নির্ভীক সেনানী। সেদিন সদ্য স্বাধীন একটি দেশের কী বিপুল উন্মাদনা! পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ আবেগে কৃতজ্ঞতায় ভারতীয় জওয়ান থেকে সেনানায়ক সবাইকে ভরিয়ে দিয়েছিল। সেই সুখস্মৃতি কোনও দিনই ভুলবার নেই। আমৃত্যু তিনি তা মনে রাখবেন।

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পর ফের সত্যবানকে ওয়েস্টার্ন কমান্ডে পাঠানো হল। পুরনো রুটিনে ফিরে গেলেন তিনি। ছুটিতে আগের মতোই রাজানগরে এসে সপ্তাহ তিনেক কাটিয়ে যেতেন। সৃষ্টি রহস্যের জাদুতে ততদিন মেয়ে রিনিও এসে গেছে পৃথিবীতে। আহ্নিকগতি বার্ষিক গতির নিয়মে এই গ্রহ পাক খেতে খেতে ঘুরে চলেছে অবিরল। সময় কেটে যাচ্ছে। কাটছে বছরের পর বছর। একদা তরুণ সত্যবান মাঝ বয়সের দিকে পা বাড়িয়েছেন। সদানন্দও সত্তর পেরিয়েছেন। চুল ধবধবে সাদা। ত্বকে আগেকার সেই চকচকে ভাবটা নেই, লক্ষ করল অগুনতি সরু সরু রেখা চোখে পড়বে। একটু ঝুঁকে হাঁটেন, চশমার পাওয়ার বেড়ে গেছে, কষের তিন চারটে দাঁত ফেলে দিতে হয়েছে। ফলে গাল কিছুটা ভেতর দিকে ঢুকে গেছে।

কিন্তু বয়সকে পরোয়াই করেন না সদানন্দ। এনার্জি সেই যুবা বয়সের মতোই অটুট। আগের মতোই রোগী দেখে চলেছেন। তবে বাইরে বেরুনোটা অনেকখানি কমেছে। চারুলতা তাঁকে বেরুতে দেন না। মনের জোর থাকলেও শরীরের ক্ষমতা যে দ্রুত কমে যাচ্ছে এটা তো ঠিক।

চারুলতার বয়সও এক জায়গায় আটকে থাকেনি। তাঁর কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে সরু সরু রুপোর তার চোখে পড়ে। শরীরও ভারী হয়েছে। জমেছে বয়সের মেদ।

রাহুল আর কাবেরী হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পর তাদের দিল্লিতে ভর্তি করে দেওয়া হল। রেসিডেন্সিয়াল কলেজ। ওরা হস্টেলে থেকে পড়ত।

রাহুল ম্যানেজমেন্টে দুর্দান্ত রেজাল্ট করে ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টে চাকরি নিয়ে আমেরিকা চলে যায়। সেখানেই সহকর্মী একটি ব্রাজিলিয়ান মেয়েকে বিয়ে করে আমেরিকান ন্যাশনালিটি নিয়েছে। ওদের একটিই মেয়ে।

কাবেরীও ভাল ছাত্রী। মেধাবিনী। মেডিক্যাল সায়েন্সে চোখ-ধাঁধানো রেজাল্ট করেছিল। ওর সঙ্গে পড়ত একটি গুজরাটি ছেলে। হরীশ প্যাটেল। হরীশরা বিশাল বড়লোক। আমেদাবাদে ওদের মস্ত গারমেন্টের বিজনেস। পারিবারিক ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে তার লেশমাত্র আগ্রহ ছিল না। মেডিক্যাল কলেজে পড়তে পড়তে রিনির সঙ্গে তার প্রেম।

রাহুল যা করেছিল, রিনিরা কিন্তু তা করেনি। রাহুল আমেরিকায় গিয়ে ব্রাজিলিয়ান মেয়েটিকে বিয়ে করে সত্যবানদের জানিয়েছে। রিনি এবং হরীশ তাদের দুই বাড়ির অভিভাবকদের জানিয়ে, তাঁদের রাজি করিয়ে, বিয়েটা করেছিল। ওদের বিয়ে হয়েছিল কলকাতায়, রাজানগরের বাড়িতে। আমেদাবাদে বিশাল আকারে হয়েছিল রিসেপশন।

বিয়ের পর কয়েক বছর দিল্লির বিরাট একটা প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করার পর রিনিরা কানাডায় চলে যায়। সেখান থেকে পাকাপাকি ভাবে যে দেশে ফিরে আসবে, তেমন সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই হয়। তাদের একটাই ছেলে।

ভারতীয় মেধা বলতে যা বোঝা যায়, সব চলে যাচ্ছে দূর দূর মহাদেশে—আমেরিকায়, ইউরোপে, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়। সেরা ডাক্তার, সেরা অধ্যাপক, সেরা গবেষক, অর্থনীতিবিদ বা ইঞ্জিনিয়ার অর্থাৎ দেশের সারাংশ যদি আর ফিরে না আসে, কী হবে ভারতবর্ষের? মাঝে মাঝে এই সব ভাবনা সত্যবানকে বিমর্ষ করে তোলে।

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। এর মধ্যে পর পর দু'টি মৃত্যু ফৌজি অফিসারটিকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে যায়। আগে চলে গেলেন সদানন্দ। তার তিন মাসের মাথায় চারুলতা। 'শান্তিনিবাস' একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। দু দু'বার রাজানগরে এসে শ্রাদ্ধ শান্তি চুকিয়ে, বগুলা সিংয়ের হাতে বাড়ির দেখাশোনার দায়িত্ব সঁপে দিয়ে ফিরে গেলেন সত্যবান।

দুই প্রিয়জনের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হল কার্গিল যুদ্ধ। পাকিস্তানি ফৌজের কত যে বুলেট উরুর পেশি ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল তার লেখাজোখা নেই। প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে। একটা সময় মনে হয়েছিল, পা'টাই কেটে বাদ দিতে হবে। টানা দু'সপ্তাহ যুঝে শেষ অব্দি সেটা বাঁচাতে পেরেছিলেন ডাক্তাররা।

কার্গিল যুদ্ধের পর আরও কয়েক বছর চাকরি ছিল। কিন্তু স্বেচ্ছাবসর নিয়ে রাজানগরে চলে এসেছিলেন সত্যবান। পায়ের জন্য বিপুল ক্ষতিপূরণ ছাড়াও প্রাপ্য বহু টাকাই পেয়েছেন। তার ওপর পেনসন।

তিনি যখন দিল্লির কমান্ড হাসপাতালে শয্যাশায়ী, খবর পেয়ে রাহুল এবং কাবেরী ফিরে এসেছিল ইন্ডিয়ায়। যতদিন না পুরোপুরি সুস্থ করে ডাক্তাররা সত্যবানকে রিলিজ করলেন ছেলে মেয়ে দেশেই থেকে গেছে। তারা বাবাকে অনেক বুঝিয়েছে, একা একা এই বয়সে রাজানগরে পড়ে থাকার মানে হয় না; এখানকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে বুকিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে যেন চলে যান। আর ক'বছরই না বাঁচবেন! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুই প্রান্তে —আমেরিকায় এবং কানাডায়—ছেলে মেয়ে নাতি নাতনিদের মধ্যে জীবনের শেষ দিনগুলো পালা করে কাটিয়ে দিন। অফুরান আনন্দে, আরামে, তৃপ্তিতে।

কিন্তু সত্যবানের ধাতটা অন্য ধাঁচের। দু'টি মানুষ—ঠাকুরদা আর বাবা—তাঁর মধ্যে ভালবাসার দু'টো বীজ বুনে দিয়ে গিয়েছিলেন। একটা হল প্রকৃতিকে ভালবাসা, অন্যটা মানুষকে।

সেই ছেলেবেলায় ঠাকুরদা তাঁকে নিয়ে সূর্যোদয়ের আগেই বেড়াতে বেরুতেন। কিছু পাকা বাড়ি থাকলেও তখন রাজানগর প্রায় গ্রামই। নামেই শহরতলি। তার সংক্ষিপ্ত চৌহদ্দি পেরুলে যে-রাস্তাটা সোজা পুব দিকে চলে গেছে সেটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে বহু দূরে চলে যেতেন। তখন কত যে পাখি এ অঞ্চলে, কত অজস্র রকমের যে গাছ! নাতিকে সব চেনাতেন অবনীকান্ত। কোনটা বুলবুলি, কোনটা দোয়েল, কোনটা দুর্গা টুনটুনি বা বসন্তবৌরি কিংবা কাঠঠোকরা, জলপিপি কি মাছরাঙা—সব জেনে গিয়েছিলেন সত্যবান। আম জাম আসশেওড়া শিশু সোনাঝুরি থেকে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া ঘোড়নিম শিরীষ পিপুল, কিছুই বাদ যেত না। তাছাড়া কত ধরনের যে শাক! কুলেখাড়া ব্রাহ্মী মেথি ইত্যাদি। রাজানগরের চারপাশে সেই সময় অগুনতি খাল বিল ভেড়ি এবং ছোট বড় নানা জলাশয়। সকালবেলায় বিশাল বিশাল জাল ফেলে মাছ ধরত জেলেরা। সেই সব মাছ নাতিকে চিনিয়ে দিতেন অবনীকান্ত। রুই কাতলা কালবোস কান মাগুর কাঠকই পায়রাতলি থেকে পাতি ট্যাংরা শোল বোয়াল।

রাত্তিরে প্রায়ই সত্যবানকে নিয়ে নিজেদের বাড়ির ছাদে উঠতেন অবনীকান্ত। মহাকাশ জুড়ে যে নক্ষত্রমালা তার কোনটা স্বাতী, কোনটা শতভিষা, কোনটা বা লুব্ধক, কোথায়ই বা সপ্তর্ষিমণ্ডল, সব দেখিয়ে দিতেন। আসলে প্রকৃতিপাঠটা শুরু হয়েছিল ঠাকুরদার কাছে। রাজানগরকে ঘিরে যে ভূখণ্ড সেখানেই বাংলার মুখের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সামরিক জীবনের বেশির ভাগটাই সত্যবানের কেটেছে ওয়েস্টার্ন কমান্ডে, দেশের পশ্চিম প্রান্তে। যেখানেই কাটান, রাজানগর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। মানুষ যেভাবে সিন্দুকে ধনরত্ন সাজিয়ে রাখে, শহরতলিতে তাঁর সেই জন্মস্থানটির হাজার দৃশ্য, অজস্র ঘটনা স্মৃতিতে ধরে রেখেছিলেন সত্যবান। মনে হতো, এর চেয়ে মনোরম স্থান সৌরমণ্ডলে আর কোথাও নেই। অবনীকান্তও তাই মনে করতেন। রাজানগরের জন্য সত্যবানের এত যে টান সেটা ঠাকুরদার কারণে। তাই অবসর নেবার পর সত্যবান ছেলেমেয়ের সঙ্গে চলে যান নি, সটান চলে এসেছিলেন রাজানগরে।

বাবা অর্থাৎ সদানন্দ দত্তচৌধুরি তাঁর ওপর ছাপ ফেলেছিলেন অন্য দিক থেকে। ডাক্তার হিসেবে সদানন্দ ছিলেন অসাধারণ। ধন্বন্তরি। ইচ্ছা করলে কলকাতা বোম্বাই দিল্লি কি মাদ্রাজে গিয়ে প্রচুর টাকা করতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি। বহুজনহিতায় তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। সংসার চালাবার জন্য যেটুকু দরকার তার বেশি সিকি পয়সাও আয় করেন নি। তাঁর ফিক্সড ডিপোজিট, এল আই সি, এন এসসি, এ জাতীয় কিছুই ছিল না। মৃত্যুর সময় ব্যাঙ্কের সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা ছিল মাত্র তিন হাজার আটশো বাহাত্তর টাকা।

উত্তরাধিকার হিসেবে ঠাকুরদা আর বাবার কাছ থেকে সত্যবান পেয়েছিলেন রাজানগরের প্রকৃতি এবং এই অঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষদের নানা দায়। অবসর নেবার পর সেটাই নিজের মতো করে পালন করে চলেছেন।

একদিকে লক্ষ্মী নাটু এবং আরও ক'টি ছেলেকে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছেন। শেষ বয়সে মানুষ যখন যাবতীয় কর্তব্য চুকিয়ে ভারমুক্ত হয়ে লঘু চালে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয়, তিনি তখন আরেক ধরনের সংসার ফেঁদে, জড়িয়ে পড়েছেন। লক্ষ্মী নাটুদের মতো আরও কত লক্ষ্মী টক্ষ্মী যে তাদের অনন্ত কষ্ট, যাতনা আর গ্লানি নিয়ে রাজানগর এবং তার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সবাইকে তো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তবে তাদের জন্য যতটুকু পারেন, করেন।

আরেকটা দিক রয়েছে সেটা এইরকম। কলকাতা তো আগের মতো উত্তরে বাগবাজার দক্ষিণে টালিগঞ্জ, এর মধ্যে আটকে নেই। চারদিকে বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে। শহরতলি ছাড়িয়ে উত্তরে দক্ষিণে পুবে। দিকে দিকে। তৈরি হচ্ছে হাইওয়ে, নতুন নতুন ফ্লাইওভার, নতুন নতুন টাউনশিপ। সরকারি বে-সরকারি কত যে হাউসিং কমপ্লেক্স! রাজানগরই বা বাদ থাকবে কেন?

ছেলেবেলায় শহরতলির এই এলাকাটা সত্যবান যেমন দেখেছিলেন, অবিকল তেমনটা কি আর আছে? রাজানগরও বেড়ে গেছে অনেকখানি। তবে কলকাতার অন্য সব দিকের মতো অঞ্চলটা সেভাবে বদলে যায় নি। পুরনো চেহারা পুরনো গন্ধ অনেকটাই থেকে গেছে। কিন্তু পূর্বাভাস যা, তাতে জায়গাটা তার প্রাচীন কাঠামো বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না। এর মধ্যেই প্রোমোটার আর ডেভলাপাররা জমির জন্য অ্যাটাচি কেস বোঝাই করে রোজই হানা দিচ্ছে। নাকের সামনে ঝুলিয়ে দিচ্ছে নানা লোভনীয় টোপ। সেকেলে বাড়িটাড়ি ভেঙে তারা নতুন নতুন হাই-রাইজ তুলবে। সেজন্য বাড়ির মালিককে দেওয়া হবে একটা কি দু'টো ফ্ল্যাট। যেমন তেমন, হেলাফেলা করার মতো ফ্ল্যাট নয়। বাথরুমে, বেডরুমে, লিভিং-কাম-ডাইনিং হলে মার্বেল বসিয়ে দেবে। বাথরুমে থাকবে দামি শাওয়ার, বাথটাব, ইত্যাদি। সেই সঙ্গে কয়েক লাখ টাকা। বাড়িসুদ্ধু বড় মাপের জমি হলে ফ্ল্যাটের সংখ্যা এবং টাকার অঙ্কও বেড়ে যাবে।

এই প্রোমোটারদের নজর শুধু রাজানগরের চৌহদ্দিতেই আটকে নেই। সত্যবান খবর পেয়েছেন, আশপাশের ছোটখাটো শহর এবং গ্রামগুলোতেও তাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কড়কড়ে তাড়া তাড়া নোট চোখের সামনে দুলতে দেখলে ক'জন আর মাথা ঠিক রাখতে পারে? বাপ-ঠাকুরদার জমিজমা ভিটমাটি নিয়ে অনেকেরই বাজে সেন্টিমেন্ট নেই। সব বেচেবুচে তারা অন্য কোথাও চলে যাবে। এর মধ্যেই হয়তো বেশ কিছু জমি হাতবদল হয়ে প্রোমোটার গর্ভে ঢুকে গেছে। এই এলাকাটা কতদিন তার আদ্যিকালের চেহারা নিয়ে টিকে থাকতে পারবে, কে জানে।

মেজর সত্যবান দত্তচৌধুরির মধ্যে অদম্য এক জেদ রয়েছে। কেউ যদি নিজের বাড়ি টাড়ি প্রোমোটারদের বেচে দেয়, তা রোখা অসম্ভব। কিন্তু খালবিল বুজিয়ে, গাছপালা নির্মূল করে, কংক্রিটের জঙ্গলে চারপাশ ছেয়ে যাবে, এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নন।

ওয়েটল্যান্ডস এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য দেশে কড়া কড়া আইন রয়েছে। মন্ত্রীরা মাঝে মাঝে হাওয়ায় সাঁই সাঁই চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে হুমকি দেন, আইন ভাঙলে রেহাই নেই। মোটা জরিমানা তো রয়েছেই, জেলের ঘানিও

ঘোরাতে হবে। কিন্তু এসব আস্ফালন যে নেহাতই ফাঁকা আওয়াজ, অন্তত প্রোমোটাররা তা ধরেই নিয়েছে। তাই আইন টাইনের তোয়াক্কা না করে রাজানগরে না হলেও অন্য সব এলাকায় জলা জায়গা বুজিয়ে তৈরি করছে নতুন নতুন টাউনশিপ, ঝাঁ-চকচকে মল। মাথা তুলছে আকাশ-ছোঁয়া সব বহুতল। আইন যদি কাগজে কলমে থেকে যায়, কঠোরভাবে প্রয়োগ করা না হয়, তা থাকার প্রয়োজন কী? কিন্তু সত্যবানেরর প্রতিজ্ঞা, রাজানগরের পরিবেশ তিনি নষ্ট হতে দেবেন না। একটা গাছও কাটা পড়ুক, চোরাগোপ্তা গুলি করে কেউ পাখি টাখি মারুক, খাল বিল কেউ বোজাবার চেষ্টা করুক—তিনি রুখে দাঁড়াবেন।

অবসর নিয়ে এখানে আসার পর তিনি একাই ছিলেন ওয়ান-ম্যান আর্মি। সাইকেলে একাই ঘুরে ঘুরে চারদিকে লক্ষ রাখতেন। কিছুদিনের মধ্যেই একে একে অনেকে এসে জুটে গেল। এদের বেশির ভাগই কেউ ছাত্র, কেউ সবে চাকরিতে ঢুকেছে। বয়স্ক বাসিন্দাদেরও এতে যথেষ্ট সায় আছে। কিন্তু সত্যবানের মতো বিপুল এনার্জি তাঁদের নেই যে হই হই করে চারদিকে নজরদারি করে বেড়াবেন। ঘরে বসে যেটুকু করা যায় তার বেশি কিছু নয়।

এখন রীতিমতো একটা বাহিনীই তৈরি হয়ে গেছে। অনেকে মজা করে বলে, মেজর'স ব্রিগেড। কেউ কেউ অবশ্য মনে করে, অকারণে সময় নষ্ট, এনার্জির অপচয়। নেই কাজ তো খই ভাজ।

জলাভূমি সংরক্ষণ, কৃষিজমি সংরক্ষণ, প্রকৃতি বাঁচাও—এসব নিয়ে মেতে আছেন সত্যবান। নিজের বাড়ির একতলার একটা ঘরে অফিসও খুলেছেন। নামকরণ হয়েছে—'সুরক্ষা'।

তিন

রাজানগরের মোটামুটি জমজমাট এলাকা ছাড়িয়ে যে চকচকে মসৃণ রাস্তাটা সোজা পুব দিকে চলে গেছে, এখন সেটা ধরে অনেক দূর চলে এসেছেন সত্যবানেরা। ছেলেবেলায় দাদুর সঙ্গে রোজ সকালে এদিকেই বেড়াতে আসতেন তিনি। রাস্তাটা সেই সময় ছিল অনেকটাই সরু। খুবই বেহাল দশা। কোথাও পাতলা পিচের আস্তর, কোথাও শুধুই খোয়া, কোথাও বা পিচ টিপ উঠে গিয়ে স্রেফ মাটি বেরিয়ে পড়েছে। এখন সে-সব স্মৃতি। রাজানগর মিউনিসিপ্যালিটি ক'বছর হল রাস্তাটার ভোল আগাগোড়া পালটে দিয়েছে।

এখানে বাঁ দিকটায় বাড়িটাড়ি খুবই কম। ছাড়া ছাড়া ভাবে টালির বা টিনের চালের ঘরই বেশি। পাকা দালানকোঠা ক্বচিৎ চোখে পড়ে। তবে রয়েছে প্রচুর ধানখেত, প্রচুর ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, আঁকাবাঁকা খাল। খালের ওপর বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর উঁচু উঁচু খুঁটির মাথায় বসে আছে কত যে মাছরাঙা। খালের জলে সরু সরু পা হাঁটু অব্দি ডুবিয়ে মৌনী ঋষিদের মতো ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে বকেরা। বক বা মাছরাঙাদের লক্ষ্য খালের দিকে। জলতলে মাছের নড়াচড়া চোখে পড়লেই তড়িৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

রাস্তার ডান পাশে তুলনায় বাড়িঘর বেশি। একটা বিরাট বাজারও রয়েছে। তার একদিকে বড় বড় ক'টা আড়ত। সেগুলো ধান চাল নুন চিনি ডাল থেকে সরষের তেল ডালডা মশলাপাতি ইত্যাদি নানা জিনিসে বোঝাই। আরেক দিকে লাইন দিয়ে স্থায়ী দোকানঘর। সামনের দিকে বিশাল চত্বর। সেখানে সারি সারি অজস্র চালা, বাঁশের খুঁটির মাথায় হোগলার ছাউনি। তবে ফাঁকা জায়গাই বেশি। এর মধ্যেই চারদিক থেকে চাষীরা জেলেরা ভ্যান রিকশায় টাটকা সবজি আর মাছ টাছ নিয়ে জড়ো হতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বিকিকিনি আর মানুষের হাঁকডাকে এলাকা সরগরম হয়ে উঠবে।

এখানেই বাজার করেন সত্যবান। আজ যেখানে যাচ্ছেন সেখান থেকে ফেরার পথে কেনাকাটা সেরে বাড়ি ফিরবেন।

যখন তাঁরা বেরিয়েছিলেন, সূর্যটা দূর দিগন্তে মাথা তুলতে শুরু করেছিল। এখন পুরোটাই উঠে এসেছে। পুব দিকে, অনেক দূরে, যেখানে গাছপালার অস্পষ্ট একটা লাইন চোখে পড়ে তার ঠিক ওপরে ফ্রিজ শটের মতো সূর্যটা দাঁড়িয়ে আছে। রোদের ঝলমলে ভাব একটু বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু তাত নেই।

রাস্তার দু'পাশের গাছগাছালির পাতায় এবং ঘাসে কুচি কুচি পোখরাজের দানার মতো এখনও শিশির জমে আছে।

মাথার অনেক ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বিদেশি, পরিযায়ী পাখি কোনাকুনি দক্ষিণ দিকে উড়ে চলেছে। রং সামান্য ধূসর। এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটা মস্ত বিল রয়েছে। ওই বিলে গিয়েই ওরা নামবে। এ-সব শীতের দেশের পাখি। ফি বছর ডিসেম্বরে এসে ফেব্রুয়ারির আধাআধি পার করে ফের ওরা নিজেদের দেশে ফিরে যায়।

সত্যবান কোনও কিছুই সেভাবে লক্ষ করছেন না। সেই অজানা লোকটা পরশু সনেকপুরের কথা বলেছিল। নিজস্ব বাহিনী নিয়ে এখন সেখানেই চলেছেন।

সনেকপুর যত কাছাকাছি এগিয়ে আসছে, ভেতরে ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা টের পাচ্ছিলেন সত্যবান। ক্রমশ সেটা তীব্র হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে কপালে ভাঁজ পড়ছিল সংশয়ের। লোকটা ফোনে সঠিক খবর দিয়েছে কি? প্রকৃতি আর পরিবেশ টরিবেশ নিয়ে সত্যবানের মাতামাতির কথা রাজানগরের বিশ পঁচিশ মাইলের ভেতর কারও জানতে বাকি নেই। সনেকপুরে গিয়ে হয়তো দেখবেন খবরটা আগাগোড়া ভুয়ো। লোকটা সকালবেলায় তাঁদের এতটা পথ দৌড় করিয়ে মজা দেখতে চেয়েছে।

সত্যবানের ডান পাশে রয়েছে রজত। সে হঠাৎ বলে উঠল, 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন জেঠু?' তার বাবা মনোতোষ লাহিড়ি সত্যবানকে দাদা বলেন। পাবুর বাবা হিরণ্ময়ের মতো। তাই তিনি রজতেরও জেঠু।

অন্যমনস্কর মতো সত্যবান সাড়া দিলেন, 'কী লক্ষ করব?'

'আকাশের দিকে তাকান।'

সামনে চোখ রেখে সাইকেল চালাচ্ছিলেন সত্যবান। মুখ তুলতেই দূর দেশের পাখির ঝাঁকগুলো চোখে পড়ল। বছরের পর বছর এদের তিনি দেখে আসছেন। ঠাকুরদা এদের কী একটা নাম যেন বলেছিলেন। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

রজত বলল, 'অন্য অন্য বছর ডিসেম্বর পড়লে ওরা আসে। এবার অনেক আগেই এসে পড়েছে।'

আস্তে আস্তে নাড়লেন সত্যবান, 'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি।'

পেছনের রো থেকে অংশু বলল, 'আমাদের কাজ কিন্তু বেড়ে গেল কাকু।' অংশুর বাবা সুধাময় রাহা সত্যবানের চেয়ে বয়সে বড়, কাজেই সত্যবান তার কাকা। সে বলতে লাগল, 'এখনই পাখিগুলোর পাহারার ব্যবস্থা করা দরকার।'

দক্ষিণের যে বিলটা ওই পাখিগুলের দু'মাসের অস্থায়ী বাসস্থান, চোরাশিকারিরা তার খবর রাখে। কবে পাখি আসবে, সে জন্য তক্কে তক্কে থাকে। ক'বছর আগে মেরে মেরে শেষ করে দিত। এমন হাল হল, মাঝখানে কিছুদিন পাখির আনাগোনা বন্ধ হয়ে গেল। এমন একটা দুঃসংবাদ কানে আসার পর সত্যবান কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন? খুনিদের জন্য পাখি টাখি আসবে না তাই কখনও হয়? তিনি বিলের চারপাশে যারা থাকে তাদের নিয়ে একটা ফোর্স তৈরি করে ফেললেন। বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী। এদের গাইড করবে ওই এলাকার বৈকুণ্ঠ মণ্ডল। বরফের দেশের পাখিরা যতদিন থাকবে বৈকুণ্ঠরা তাদের পাহারা দেবে।

পাখিদের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিভাবে কিভাবে তাদের কাছে বার্তা পৌঁছে গেছে যে ভয় নেই। তাদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত হয়েছে। বৈকুণ্ঠরা চোরাগোপ্তা শিকার বন্ধ করে দিয়েছে। ফের পাখিদের যাতায়াত শুরু হয়েছে। শীতের দু'মাস তারা দক্ষিণের বিলে পুরোপুরি নিরাপদ।

সত্যবান বললেন, 'হ্যাঁ। দু'চারদিনের ভেতর বৈকুণ্ঠদের ওখানে যেতে হবে। বিলে পাখি নামলেই ওরা নজর রাখে। তবু একবার গিয়ে হুঁশিয়ার করে দিতে হবে। পোচারগুলো এককেটা মূর্তিমান শয়তান।'

ওঁরা যেখানে এসে পৌঁছেছিলেন সেখান থেকে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়ে একটা গেছে বাঁ দিকে, আরেকটা কোনাচে হয়ে ডাইনে। সত্যবান ডান পাশের পথটা ধরলেন। দেখাদেখি বাকি সবাই।

খানিকটা গেলেই তিন চার বিঘে জুড়ে একটা বিরাট জলা জায়গা। সেটার চারপাশে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু সেকেলে দালানকোঠা। টিনের খড়ের আর টালির চালের প্রচুর ঘরবাড়িই অবশ্য বেশি করে চোখে পড়ে। এখানে ভাঙাচোরা পিচের রাস্তা যেমন আছে তেমনি রয়েছে মেটে পথও। আধা-গ্রাম আধা-শহর এই এলাকাটা রাজানগর মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে। এটাই সনেকপুর।

সত্যবানরা জলাটার পাশে এসে থামলেন। এই অঞ্চলের সমস্ত কিছু হাতের তালুর মতোই তিনি চেনেন।

জলার একধারে মুসলমান পাড়া। অন্য দিকটায় রয়েছে হিন্দুরা, অল্প ক'টি বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারও।

সত্যবান তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জলাটা দেখছিলেন। পাবুরা বেশ অবাক হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কি জেঠু, এখানে এলেন যে!'

জলাশয়ে চোখ রেখে সত্যবান বলেন, 'এটাই আমাদের ডেস্টিনেশন।'

পাবুদের বিস্ময়ের মাত্রাটা চড় চড় করে অনেকটা বেড়ে যায়। দু'দিন ধরে রহস্য কাহিনির মতো একটা আবহাওয়া তৈরি করে শেষ অব্দি কিনা সনেকপুরের জলা! ওরা ভেবেছিল, না জানি কোন একটা দম-আটকানো, রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির খাসমহলে গিয়ে পড়তে হবে। বিমূঢ়ের মতো একসঙ্গে সবাই বলে ওঠে, 'এখানে কী?'

সত্যবানের জবাব দেওয়া হয় না। তার আগেই মুসলমান পাড়া থেকে আট দশজন তাঁদের দেখতে পেয়ে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে আসে। এদের কয়েকজন যুবক, বাকিরা মাঝবয়সী। সবার আগে যে রয়েছে তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। লম্বা চওড়া, শক্তপোক্ত চেহারা। মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথায় অবশ্য চুল টুল কম। রীতিমতো টাক পড়ে গেছে। চোখেমুখে সহজ সরল ভালোমানুষির ছাপ। পরনে লুঙ্গি আর ফতুয়া, তার ওপর পাতলা চাদর জড়ানো। নাম হাফেজ আলি। সনেকপুরের মুসলমান পাড়ার মুরুব্বি। সত্যবানের সঙ্গে ভালই জানাশোনা আছে।

এই সকালবেলায় সত্যবান এবং তাঁর ফৌজ এখানে আসতে পারে, ভাবতেই পারে নি হাফেজরা। সে বলল, 'বড়সায়েব আপনারা!'

রাজানগরে সত্যবানকে কেউ বলে মেজর সাহেব, কেউ কেউ বা জেঠু, কাকু ইত্যাদি। কিন্তু রাজানগরের বাইরে ডাকটা বদলে যায়। তখন তিনি বড়বাবু, বড়বাবা বা বড়সায়েব।

সত্যবান বললেন, 'একটা খবর পেয়ে আসতে হল।'

হাফেজ উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কী খবর?'

'বলব বলব। তার আগে বল তোমরা কেমন আছ?

হাফেজ আলি জানায়, আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে তারা ভাল আছে।

ওদিকে হিন্দু এবং খ্রিস্টান পাড়াতেও সত্যবানদের আসার খবরটা চাউর হয়ে গিয়েছিল। ছুটতে ছুটতে অনেকেই এসে তাঁদের ঘিরে দাঁড়ায়। গোবিন্দ মণ্ডল, জন নিরাপদ বিশ্বাস, শিবু নস্কর, রামগতি ঘোষ, ইত্যাদি ইত্যাদি। হাফেজ আলিদের মতো সত্যবানদের দেখে তারাও কম অবাক হয় নি। বলল, 'এবেরে অনেকদিন বাদে আলেন—' কলকাতার এত কাছাকাছি থেকেও এদের জিভ থেকে গেঁয়ো টানটা মুছে যায় নি।

সত্যবান সায় দিয়ে মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ। চার পাঁচ মাস সনেকপুরে আসা হয় নি।' আসলে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে এধারে এলে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে অনেক দূরে চলে যান। ডান ধারে সনেকপুরে আসা হয় না।

সত্যবান হাফেজ আলিদের মতো শিবু নিরাপদ গোবিন্দরা কে কেমন আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা কী করছে, জেনে নিলেন।

একধারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হাফেজ আলির উৎকণ্ঠা বাড়ছিল। বলব কি বলব না, ভাবতে ভাবতে শেষ অব্দি দ্বিধা কাটিয়ে বলেই ফেলল, 'কী একটা খবর পেয়ি ঝ্যানো এয়েচেন বড়সায়েব?'

সত্যবান তার দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার বলছি।' জলার দিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা নাকি বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে?'

সত্যবান যখন হাফেজ আলিকে প্রশ্ন করছেন তখন জনতা নিজেদের মধ্যে নানা কথা বলছিল। তাঁর সম্পর্কে এই অঞ্চলের সবার অসীম শ্রদ্ধা। ইনি দু দু'টো যুদ্ধ করেছেন, পাকিস্তানিদের গুলিতে উরু টুটোফুটো হয়ে গিয়েছিল, তাঁকে বীরচক্র দেওয়া হয়েছে। অবসর নেবার পর বিলেত না আমেরিকায় চলে যেতে পারতেন, যান নি, এখানেই থেকে গেছেন। মানুষের জন্য কত রকম কাজ করেন। গরিবগুরবোরা তাঁর কাছে গেলে খালি হাতে ফেরে না। তাঁকে ঘিরে নানা মিথ, নানা রূপকথা।

সনেকপুরে আজ হঠাৎ সত্যবান চলে আসায় গোবিন্দ নিরাপদরা খুব খুশি। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে সত্যবানের প্রশ্নটা শুনে আচমকা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে জনতা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাদের চোখেমুখে অস্বস্তি ফুটে বেরোয়। নাকি ত্রাস?

সত্যবানের কপালে ভাঁজ পড়ে। এর ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বলেন, 'কী হল, সবাই বোবা হয়ে গেলে যে!'

আরও দু-চারবার একই প্রশ্ন করায় শেষ অব্দি হাফেজ আলি বারকয়েক ঢোক গিলে ভয়ে ভয়ে বলে, 'হ্যাঁ বড়সায়েব, উই দ্যাখেন—' বলে জলার ডান দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

আগে নজরে পড়ে নি। এবার সত্যবান দেখতে পেলেন, পাড় থেকে চার শো ফিটের মতো লম্বা এবং তিন শো ফিটের মতো চওড়া জলার অনেকটা অংশ সারি সারি শালের খুঁটি পুঁতে ঘিরে ফেলা হয়েছে। শুধু তাই না, ঘেঁষ, সুরকি, ভাঙা ইট পাথর দিয়ে তার আধাআধি বোজানো।

পরশু রাতে সেই লোকটা তা হলে ভুল খবর দিয়ে তাঁকে এখানে টেনে আনে নি? উত্তেজিত সত্যবান আধবোজানো জায়গাটার কাছে চলে এলেন। হাফেজ আলিরাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'জলা টলা যে বোজানো যায় না, গভর্নমেন্টের আইন আছে, তোমরা সেটা জানো?

সবাই ঘাড় কাত করে—জানে।

'এই জলাটা সরকারদের না?'

সত্যবান শুনেছিলেন, এই অঞ্চলে জলা ছাড়াও প্রচুর জমিজমা আছে সরকারদের। তাঁরা একসময় ছিলেন এখানকার পুরনো বাসিন্দা। তবে বহুকাল হল কলকাতায় বাড়ি করে সেখানেই থাকেন। এর বেশি আর কিছু জানা নেই।

হাফেজ আলিরা জানায়, সত্যবান ঠিকই বলেছেন, জলার মালিক সরকার বাবুরাই।

'তাঁরাই কি এটা বুজিয়ে ফেলছেন?'

'না।' গোবিন্দ মণ্ডল বলল, 'আগে আগে বুড়ো সরকার বাবু এসতেন। তেনি মারা গেচেন। তিন বচ্ছর কেউ আর আসে না। শুনিচি বুড়ো বাবুর ছেলেপুলেরা কলকাতাতেও থাকে না। বিলেত না কোতায় ঝ্যানো চলে গেচে।'

'আশ্চর্য, তা হলে বুজোচ্ছে কে?'

কেউ মুখ খুলতে চায় না। সত্যবান প্রচণ্ড ধমক ধামক দেবার পর হাফেজ আলি মিনমিনে এস্ত গলায় বলল, 'গাল-কাটা গাব্বারা।'

'তারা কারা?'

'পোমোটারের লোক।'

পোমোটার যে প্রোমোটার তা বুঝতে পারছিলেন সত্যবান। তাঁর কপালের ভাঁজ আরও বাড়ল। গলা চড়িয়ে বললেন, 'মগের মুল্লুক নাকি: একে অন্যের সম্পত্তি, তার ওপর জলা বুজিয়ে দখল করে নিচ্ছে! চোখের সামনে বে-আইনি কাজ চলছে দেখেও তোমরা মুখ বুজে আছ!'

গলার স্বর অনেকখানি খাদে নামিয়ে জন নিরাপদ বিশ্বাস বলল, 'কী করব বড়বাবু, ওরা সব্বোক্ষণ মিশিন নে (নিয়ে) ঘোরে। সনেকপুরের সব্বাইকে শাসানি দে গেচে, চুপচাপ ঝ্যানো আমরা দেকে যাই, কেউ টুঁ আওয়াজটুকু না করি। করলে আমাগেরে লাশ বানিয়ে দেবে।'

নিরাপদর কথাগুলোর সঙ্গে শিবু নস্কর আরও একটু জুড়ে দিল, 'গাল-কাটা গাব্বারা যে কী হারামি, ভাবতি পারবেন না। ছেলাপুলা নে ঘর করি। ওদের কথামতো না চললি জানে বাঁচতি হবে না।'

গাল-কাটা গাব্বার নামটা আবছা আবছা মনে পড়ছিল সত্যবানের। কোথায় শুনেছিলেন, খেয়াল নেই। লোকটা মারাত্মক বন্দুকবাজ। বয়স বেশি নয়—তিরিশ বত্রিশ।

প্রোমোটারদের নানা কীর্তিকাহিনির খবর প্রায় রোজই কাগজে বেরোয়। দু-চারটে ভাল প্রোমোটার যে নেই তা নয়। তারা আইন মেনে চলে। তবে

বেশির ভাগই নানা ফন্দি এঁটে, নাকের ডগায় লোভনীয় টোপ ঝুলিয়ে, কখনও বা গানম্যান লেলিয়ে দিয়ে দামি দামি জমি ছিনিয়ে নেয়। যে প্রোমোটারটা সরকারদের জলা ভরাট করছে সে-ই গাল-কাটা গাব্বাদের জলা বোজানোর কাজে লাগিয়ে দিয়েছে।

সত্যবান বললেন, 'ওদের কিছু না বল, আমাদের 'সুরক্ষা'র অফিসে তো খবরটা দিতে পারতে।' তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই এই অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বে-আইনি জলাজমি ভরাট, গাছটাছ কেটে পরিবেশ ধ্বংস করার মতো ঘটনা ঘটতে দেখলেই তাঁকে জানাতে বলেছিলেন।

হাফেজ আলি বলল, 'তরাসে দিতি পারি নি।'

পরিবেশ বাঁচানো বা জলাভূমি সংরক্ষণের মতো মহৎ মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেয়ে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করা যে এইসব নিরীহ ভীরু ছাপোষা মানুষগুলোর কাছে অনেক বেশি জরুরি সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। সত্যবান আরও জেনে নিলেন, গাল-কাটা গাব্বারা রাত্তিরে ট্রাক বোঝাই করে ভাঙা ইট পাথর এবং নানা ধরনের রাবিশ এনে শাল খুঁটির ঘেরের ভেতর ফেলছে। ওদের ছকটা এইরকম। এই অংশটা ভরাট হলে, জলার আরও খানিকটা এলাকা খুঁটি পুঁতে ঘিরে বুজিয়ে দেবে। এইভাবে ধাপে ধাপে পুরোটাই ভরাট করে ফেলবে। এখানে তিন বিঘের মতো যে জলাশয়টা রয়েছে, দু'-চার মাসের ভেতর তার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পেয়ে যাবে।

সত্যবান বললেন, 'ঠিক আছে, এই ব্যাপারটা আমিই দেখব।'

হাফেজ আলির মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে সে বলে, 'কিন্তুন বড়সায়েব—'

হাফেজের চোখের দিকে তাকিয়ে সত্যবান বললেন, 'কিন্তু কী?'

'গাল-কাটা গাব্বারা এককেটা হাড়ে হারামজাদা। আস্ত শয়তান। কতায় কতায় মিশিন চালায়ে দ্যায়—'

'মিশিন' শব্দটা একটু আগেই কার মুখে যেন শুনেছেন। বস্তুটা ঠিক কী, তাঁর জানা নেই। বললেন, 'মিশিন কাকে বলে হাফেজ?'

'পেস্তল, বন্দুক—'

জলা বোজানোর মতো গর্হিত কাজটা স্বচক্ষে দেখার পর মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল সত্যবানের। হঠাৎ ভীষণ মজা লাগল তাঁর। যিনি পাকিস্তানিদের মেশিন গান, কামানোর গোলা বা বিমান হানা পারোয়া না করে, বুক চিতিয়ে লড়াই করে গেছেন, দু দু'বার, যাঁকে অসীম সাহসিকতার জন্য 'বীরচক্র' দিয়ে সম্মান জানানো হয়েছে, তাঁকে ক'টা পাতি ভাড়াটে গুণ্ডার বন্দুক রিভলভারের

ভয় দেখাচ্ছে হাফেজ আলি। এই সোজা সরল মানুষটা সত্যিই তাঁকে ভালবাসে। তাঁর লেশমাত্র অনিষ্ট যাতে না হয়, তাই সতর্ক করে দিয়েছে।

হাফেজের কাঁধে হাত রেখে একটু হেসে নরম গলায় সত্যবান বললেন, 'আমার জন্যে চিন্তা কোরো না।'

ওধার থেকে জন নিরাপদ বিশ্বাসরা বলে ওঠে, 'আপনি কইলেন বটে, চিন্তাটা কিন্তুন হচ্চে বড়বাবু।'

'কেন?'

'ওদের পেচনে পাট্টি আচে।'

পাট্টি মানে পার্টি। রাজনৈতিক দল। পলিটিকস যে আজ রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তার শিবা উপশিরায় ঢুকে গেছে, সত্যবানের তা অজানা নয়। নেতারা নিজেদের স্বার্থে গাল-কাটা গাব্বার মতো অ্যান্টি-সোশালদের পোষে, লালনপালন করে, নানা নোংরা কাজে লাগায়। পার্টির ছত্রছায়ায় বিষাক্ত ভাইরাসের মতো এরা পুষ্ট হয়।

সত্যবান জানতে চাইলেন, 'কোন পার্টি?'

নিরাপদরা বলল, 'জানি না বড়বাবু—'

এই অঞ্চলে সব পার্টিরই অফিস রয়েছে। মাঝে মাঝেই মিটিং মিছিল করে, ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে, গলায় রক্ত তুলে স্লোগানে স্লোগানে আকাশ চৌচির করে ফেলে। এ ছাড়া বিশেষ কোনও ইস্যুতে বারো ঘণ্টার বন্ধ কি পথ অবরোধ, এ-সব তো হামেশাই চলছে। রাজনৈতিক দলগুলো এইভাবে জানান দেয়, তারা আছে, প্রবলভাবেই আছে।

এখানকার কোন পার্টির ছাতার তলায় গাল-কাটা গাব্বারা ঘাঁটি গেড়েছে সেটা জানতে পারলে কাজটা অনেক সহজ হতো। সোজাসুজি সেই পার্টির অফিসে হাজির হয়ে বলা যেত, এক্ষুনি জলা বোজানো বন্ধ করা হোক। আপাতত তার উপায় নেই। এখন সবার আগে খোঁজ করে দেখতে হবে, গাব্বাদের পেছনে কোন প্রোমোটার রয়েছে। আজকাল প্রোমোটার মানেই পলিটিক্যাল পার্টি। প্রোমোটার, ডেভলাপার আর পার্টির মধ্যে যে গোপন গাঁটছড়া বাঁধা থাকে, পাঁচ বছরের বাচ্চারাও তা জেনে গেছে। গাব্বাদের যে প্রোমোটার কাজে লাগিয়েছে তার হদিস পাওয়া গেলে সেই সুতো ধরে রাজনৈতিক দলটারও সন্ধান মিলবে।

সত্যবান বললেন, 'ঠিক আছে, আজ আমরা চলি। পরে আবার দেখা হবে।'

হাফেজ আলি জিজ্ঞেস করল, 'একন তা হলি আমরা কী করব?'

'কিচ্ছু করতে হবে না। যেমন মুখ বুজে ছিলে তেমনি থাকবে। যা করার আমি করব।'

সাইকেলে চেপে ফিরতে ফিরতে লঘু সুরে সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'গাব্বা নামের এই মহামানবটি 'গালকাটা' খেতাব কেমন করে পেল, তোরা কেউ জানিস?'

যিশু এ অঞ্চলের কিছু কিছু খবর রাখে। সে বলে, 'ওদের রাইভ্যাল গ্যাংয়ের সঙ্গে লড়তে গিয়ে চপারের কোপ খেয়ে একটা গাল দু' ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। সেলাই টেলাই করে ডাক্তাররা গাল জুড়ে দিয়েছে। ঘা শুকিয়েছে কিন্তু দাগটা থেকে গেছে। সেই থেকে ওই নামেই সে ফেমাস।'

সত্যবান বললেন, 'আই সী—'

একটু চুপ করে থেকে যিশু এবার বলে, 'জেঠু, এই গাব্বা আর তার গ্যাংটা ভীষণ ডেঞ্জারাস।'

যিশুর গলায় এমন উৎকণ্ঠা ছিল যে মুখ ফিরিয়ে তাকে একবার দেখে নিলেন সত্যবান। বললেন, 'হাফেজদের মতো ঘাবড়ে গেছিস দেখছি। ক'টা আন্টি-সোশালের ভয়ে কুঁকড়ে গেলে ওয়েটল্যান্ড নেচার এনভায়রনমেন্ট, এসব বাঁচাবি কী করে?'

যিশু শুকনো মুখে বলল, 'সনেকপুরের লোকগুলো বলছিল না ওদের পেছনে পলিটিক্যাল পার্টি আছে। তাই—'

যত বড় বজ্জাত বন্দুকবাজই হোক না, তাদের টিট করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর আশকারা পেয়ে এরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। হাফেজদের মতো সেই কারণেই ভয় পাচ্ছে যিশু। কিন্তু গাল-কাটা গাব্বারা যা খুশি করে বেড়াবে তা তো মেনে নেওয়া যায় না। সত্যবান আর কিছু বললেন না, সনেকপুরের জলাটা কিভাবে বাঁচানো যায়, মনে মনে তার ছক ঠিক করে নিতে লাগলেন।

চার

সেই বিশাল বাজারটার সামনে সত্যবানরা যখন পৌঁছলেন, বেলা আরও একটু চড়েছে। কিছুক্ষণ আগে যখন সামনের রাস্তা দিয়ে সনেকপুরের দিকে যান, জায়গাটা সবে আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছিল। আনাজওলারা মাছওলারা প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতে ভ্যানে মালপত্র চাপিয়ে, কেউ কেউ বা মাথায় ঝাঁকা নিয়ে, আসছিল।

এখন ভোরের ঘুমন্ত বাজারটাকে আর চেনা যায় না। চারদিক গমগম করছে। প্রচুর ভিড়। পুরোদমে বেচাকেনা চলছে।

এই অঞ্চলটার নাম সোনাডাঙা। যেদিন সত্যবান বাজার করেন, এখানে এসে অংশু টংশুদের রাজানগরে পাঠিয়ে দেন। কেননা ওদের কারওকে কলেজে যেতে হবে, কারওকে অফিসে। ওরা চলে গেলে ধীরে সুস্থে তরিতরকারি মাছমাংস ফলটল কেনেন।

আজ রজত ছাড়া বাকি সবাইকে রাজানগরে চলে যেতে বললেন সত্যবান।

রজত অবাক। 'এ কী, আমাকে আটকে রাখলেন যে!'

'দরকার আছে।'

'আমার ক্লাস রয়েছে—'

'একদিন কলেজে না গেলে পৃথিবী রসাতলে যাবে না। পরে এক্সট্রা ক্লাস নিয়ে পুষিয়ে দিস। তোর স্টুডেন্টদের ক্ষতি হোক, আমি চাই না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রজত। 'ঠিক আছে। কিন্তু দরকারটা কী?'

সত্যবান ধমকে ওঠেন, 'এত অধৈর্য কেন? একটু পরেই সব জানতে পারবি। আয় আমার সঙ্গে—'

সাইকেল দু'টো চেইন দিয়ে একটা মোটা গাছের গায়ে বেঁধে তালা লাগালেন সত্যবানরা। তারপর বাজারের ভেতর ঢুকতে গিয়ে দেখতে পেলেন একপাশে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের তলায় মথুরানাথ চক্রবর্তী, ভানুমতী ভট্টাচার্য, বহিরুদ্দি মণ্ডল এমন আরও কয়েকজন। মথুরানাথের বয়স সত্তর পেরিয়েছে। রোগাভোগা, খুনখুনে, শীর্ণ চেহারা। পাটকাঠির গায়ে চামড়া জড়ালে যেমনটা দেখায়, প্রায় সেইরকম। প্রাইমারি স্কুল মাস্টারি করতেন। রিটায়ারমেন্টের পর যা পেয়েছিলেন পোস্ট অফিসে রেখেছেন। মাসে মাসে যা সুদ পান তাতে রোগের খরচই ওঠে না, খাবেন কী? তিন কুলে তাঁর কেউ নেই। ভানুমতী বিধবা, তাঁর ছেলেমেয়ে থেকেও নেই। তারা থাকে কলকাতায়, মাকে দেখে না।

ভানুমতীরা ছাড়াও আর যারা রয়েছে তারা সবাই বুড়ো ধুড়ো, ক্ষয়াটে চেহারা। তাদেরও হাল একই। সোনাডাঙার পেছন দিকে যে পুরনো ছোট শহরটা রয়েছে যার নাম মোতিগঞ্জ, এরা সেখানকার বাসিন্দা। বহিরুদ্দি মণ্ডলের বাড়ি কাছাকাছি একটা গাঁয়ে। তার ছেলেমেয়ে বিবি কবেই মরে হেজে গেছে। থাকার ভেতর একটা নাতি। সামান্য কিছু জমিজমা আছে, তার আয়ে চলতে চায় না। নিজের বারোমাস হাঁপানি। এদিকে নাতিটা লেখাপড়ায় ভাল। আজকাল পড়ার খরচ কি কম! গায়ে খেটে অন্য কিছু করে যে বাড়তি রোজগার করবে, রুগ্ণ শরীরে তেমন জোর আর নেই। নাতি রসুলের পড়া কবেই বন্ধ হয়ে যেত, যদি না সত্যবান তাদের পাশে দাঁড়াতেন।

যেদিনই সত্যবান বাজারে আসেন মথুরানাথরা লাইন দিয়ে তেঁতুল গাছ তলায় দাঁড়িয়ে থাকেন। ভানুমতী শুধু মাসে দু'বার এসে দাঁড়ান।

মথুরানাথদের কথা ভূ-ভারতের কারও জানতে বাকি নেই। রজতও জানে। সে নিচু গলায় বলল, 'আপনার পাওনাদাররা সব ওয়েট করছে।'

চোখের কোণ দিয়ে এক লহমা রজতকে দেখে নিয়ে তেঁতুলতলার দিকে তাকান সত্যবান। তাঁকে দেখে মথুরানাথদের মুখগুলো আলো হয়ে উঠেছে। ওঁরা এগিয়ে আসছিলেন। মৃদু হেসে, হাত তুলে সত্যবান বললেন, 'আসবেন না, আসবেন না। ওভাবেই থাকুন। আমি বাজারটা সেরে আসি।'

সবাই থেকে গেলেও বহিরুদ্দিকে ঠেকানো গেল না। সে চলে এল।

বাজারে ঢুকলে প্রথমেই সারি সারি চালার তলায় মাছ নিয়ে বসেছে জেলেরা। বেশির ভাগই লোকাল মাছ। একেবারে তরতাজা। চারপাশের খাল বিল আর ভেড়ি থেকে ধরে আনা হয়েছে। রুই কাতলা চারাপোনা বাটা ভেটকি ট্যাংরা পাবদা, ইত্যাদি ইত্যাদি। জ্যান্ত মাছগুলো কাঁধা উঁচু মস্ত মস্ত টিনের পরাতে জলের ভেতর খলবল করে লাফাচ্ছিল। এ ছাড়া বিরাট বিরাট চালানি মাছও রয়েছে। অন্ধ্রের কাতলা বা রুই, ইউ পি'র চিতল বোয়াল আড়।

মাছের বাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'পড়াটা ঠিকমতো করছে তো রসুল?'

এই সোনাডাঙা বাজার এলাকায় সত্যবানকে সবাই বলে বড়বাবা। বহিরুদ্দি বলল, 'খু-উ-ব বড়বাবা। দিবারাত্তির বইয়ের ভেত্‌রে ঘাড় গুঁজে আচে।'

'উচ্চ মাধ্যমিকের আর বেশি দেরি নেই। মোটে ক'টা মাস। অঙ্কের আর ইংরেজির মাস্টার মশাইদের ঠিকানা দিয়েছিলাম। তাঁদের কাছে পড়তে যাচ্ছে তো?'

'হ্যাঁ বড়বাবা।'

কিছু একটা ভেবে সত্যবান বললেন, ‘রসুলটা রোগাপটকা ছেলে। তার ওপর এত খাটুনি। পুষ্টিকর খাবার টাবার না দিলে শরীর ভেঙে পড়বে। দিচ্ছিস তো?’

‘আপনি ঝা দ্যান তা-ই দিই। তার বেশি দামি জিনিস কী করে খাওয়াব?’

সত্যবান পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে একখানা একশো টাকার আর একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বহিরুদ্দিকে দিতে দিতে বললেন, ‘একটা দিশি মুরগি কিনে নিয়ে যা, আর এক শিশি হরলিকস। হরলিকসটা রোজ দিবি।’

‘দেব। আপনার মেহেরবানি বড়বাবা। সালাম—’

মাথা ঝুঁকিয়ে, কৃতজ্ঞ বসিরুদ্দি কপালে হাত ঠেকিয়ে, চলে যায়।

মাছের বাজারে সত্যবান পা রাখতেই হই হই শুরু হয়ে গেল। মাছওলারা এক নাগাড়ে ডাকাডাকি করছে, ‘বড়বাবা আমার ইদিকে আসেন।’ কেউ বলছে, ‘আপনার তরে (জন্য) টাটকা মাছ রেকে দিইচি। কেউ বলছে, ‘আজ কিন্তুন আমার পালা’। ইত্যাদি ইত্যাদি।

সত্যবান কাউকেই ‘না’ বলেন না। বাজারে এত মাছওলা। সবার কাছ থেকে একদিনে তো আর কেনা যায় না। আজ হয়তো দু’ তিন জনের কাছ থেকে কিনলেন, পর দিন অন্য ক’জনের কাছ থেকে। বাঁধাধরা কেউ নেই। সকলকেই তিনি খুশি রাখেন।

কত রকম মাছ যে তাঁকে কিনতে হয়! মথুরানাথ চক্রবর্তীর জন্য লাফানো চারা পোনা। তেঁতুলতলায় আরও দু’জন দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গাধর দাস আর ভবতারণ তালুকদার। গঙ্গাধর পেটরোগা লোক; শিঙি মাগুর ছাড়া তার পেটে কিছু সয় না। ভবতারণের বাছবিচার নেই। একটু মাছ হলেই হল। খয়রা তেলাপিয়া পার্শে—যা হোক।

ঘুরে ঘুরে প্রচুর মাছ কিনলেন সত্যবান। প্ল্যাস্টিকের আলাদা আলাদা ব্যাগে পুরে জেলেরা প্রত্যেকটার মুখ বেঁধে দিয়েছিল। নিজের বাড়ির জন্য কিনলেন আড়াই কেজি ওজনের কালবোস। অনেকদিন পর এত বড় কালবোস পাওয়া গেল। এছাড়া কিনলেন পাবদা, দিশি সরপুঁটি এবং কিছু চুনো মাছ। সব মাছ মস্ত চটের ব্যাগে ভরে সবজির বাজারে চললেন সত্যবান।

একধারে নিচু অনেকটা জায়গা জুড়ে আনাজ নিয়ে বসেছে চারপাশের চাষিরা। তারাই নিজেদের জমিতে বেগুন টোমাটো পেঁয়াজকলি লঙ্কা কাগজিলেবু পালং থেকে শুরু করে রকমারি সবজি ফলায়। যে মরশুমের যা। ভোর হতে না-হতেই এখানে বেচতে চলে আসে।

বাজারের এই অংশটার মাথায় খোলা আকাশ। ছাউনি টাউনি তোলা হয় নি। পুজোর পর থেকে সেই ফাল্গুনের শেষাশেষি অব্দি ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তাই যে যার মতো অনেকটা জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতে পারে। বর্ষায় অবশ্য অন্য দিকের সারবন্দি চালার তলায় আর সব দোকানিদের সঙ্গে এদের গাদাগাদি করে বসতে হয়।

সবজির এলাকায় সত্যবান আসতেই মাছের বাজারের মতোই ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল। এখানেও তিনি পালা করে কেনাকাটা করেন। আগের দিন যাদের কাছে কিনেছেন, পরের দিন তারা বাদ।

ঘুরে ঘুরে ব্যাগ বোঝাই করে প্রচুর আনাজ আর শাক কিনলেন। কত রকমের যে শাক! থানকুনি, কুলেখাড়া, লাউশাক, গিমে।

হঠাৎ দূর থেকে আবদুলের ডাক কানে এল। 'বড়বাবা, আজ নতুন জিনিস এনিচি। নেবেন না?'

আগের দিন আবদুলের কাছ থেকে আনাজ কিনেছেন। তাই তার নাম আজ লিস্ট থেকে বাদ। কিন্তু সেদিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, বেশ কিছু ফুলকপি বেতের প্রকাণ্ড ঝুড়িতে সাজানো রয়েছে। শীতের এই সবজি আজই প্রথম সোনাডাঙার বাজারে দেখা গেল। লোভটা সামলানো গেল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সত্যবান।

কপি এখনও তেমন আঁট ধরে নি। ফুলগুলো ছাড়া ছাড়া, সাইজও বড় নয়। তবু বছরের নতুন আনাজ। নিয়মভঙ্গ করে নেওয়া যেতেই পারে। সত্যবান বললেন, 'দে গোটা চারেক।'

মাঝবয়সী আবদুলের চেহারা ভারী ধরনের। পরনে লুঙ্গি আর ঢোলা সবুজ জামা। তার ওপর সস্তা রোঁয়াওলা হাফ-হাতা সোয়েটার। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। হেসে হেসে বলল, 'চারটে কপি দে কী করবেন বড়বাবা? রাস্তায় নাইন দে আপনার পুষ্যিরা দেঁড়িয়ে রয়েচে। চিলের মতোন ছোঁ মেইরে নে যাবে! বেশি করে নিলি তভু এক-আধখানা বাড়ি অব্দি পৌচুবে।' বলতে বলতে পাটের মোটা সুতো দিয়ে আটটা কপি পাতাসুদ্ধ বাঁধতে বাঁধতে সামান্য বিমর্ষ সুরে বলতে লাগল, 'আর কদ্দিন আপনাগেরে কপি খাওয়াতি পারব ঝানি না।'

সত্যবান অবাক। 'কেন, জমিতে আর কপির চাষ করবি না?'

'জমিন আর ধরি রাকতে পারব কিনা, ওপরবালাই ঝানে।'

সত্যবানকে এবার উদ্বিগ্ন দেখায়। —'কেন, জমিজমা বেচে দিবি নাকি?'

আবদুল গলার স্বর নামিয়ে সর্তক ভঙ্গিতে বলে, 'সে অনেক কতা বড়বাবা।

দু-এক মাস দেকি, তা'পরে আপনার বাড়ি গে সব বলব। আমাগের উদিগের চার পাঁচখানা গাঁয়ের লোকজনও আমার সন্‌গে ঝাবে।'

সনেকপুরের জলা তো ছিলই। মাথার ভেতর একটা আনকোরা টেনশন ঢুকিয়ে দিল আবদুল। এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করলেন না সত্যবান। যখন জানাবার তখন ওরাই জানাবে। বললেন, 'কপির দাম কত দেব রে?'

আবদুল বেশ চালাক চতুর। সে জানে, সত্যবানের সঙ্গে দরাদরি করতে গেলে আখেরে লোকসান। যে দাম সে মনে মনে ঠিক করেছে, মুখ ফুটে তা না চাইলে, ঢের বেশিই পেয়ে যাবে। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে এক গাল হেসে বলল, 'আপনি ঝা দ্যান—'

'আমি যদি আড়াই টাকা দিই?'

'তাই মাতায় করে লোবো।'

'ব্যাটা বজ্জাতের ধাড়ি!' আবদুলকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে কপিগুলো ব্যাগে ঢোকালেন সত্যবান।—'কি রে, খুশি তো?'

পঁচিশ টাকা প্রায় আশাতীত। আবদুলের মুখের হাসি আরও চওড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

বাড়িতে ডিম আছে কিনা, মনে পড়ল না সত্যবানের। লক্ষ্মীও কিছু বলে দেয় নি। গফুর নামের ডিমওলাটার কাছ থেকে এক ডজন হাঁসের ডিম আর এক ডজন মুরগির ডিম কিনলেন সত্যবান। বাড়িতে তিনশো লিটারের পেল্লায় ফ্রিজ রয়েছে। ডিমগুলো তার ভেতর কয়েক দিন রাখা যায়, নষ্ট হবার ভয় নেই।

সবজি বাজারের এক কোনায় ক'জন ফল নিয়ে বসে। তাদের ভেতর রয়েছে হাজারি বুড়ি এবং তার নাতনি চম্পা। ফুলের নামে নাম মেয়েটার। ওর ঠাকুমার নামটা কিন্তু ভারি অদ্ভুত। হাজারি কথাটার একটা মানে নিশ্চয়ই আছে। তবে সেটা কেন মানুষের নাম হবে, অনেক ভেবে দেখেছেন সত্যবান কিন্তু তলকূল পাননি।

মাছ আর সবজির ব্যাগ দু'টো বোঝাই হয়ে গেছে। একার পক্ষে বয়ে বেড়ানো কষ্টকর। রজত সত্যবানের হাত থেকে আগেই একটা ব্যাগ টেনে নিয়েছিল।

ভানুমতী তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর জন্য কিছু ফলটল কিনতে হবে। তা ছাড়া বাড়ির জন্যও দরকার। রজতকে সঙ্গে করে হাজারি বুড়িদের সামনে চলে এলেন সত্যবান। অন্য সব জিনিস পালা করে এর ওর কাছ থেকে কেনেন, কিন্তু ফলের জন্য হাজারি বুড়ি ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবেন না।

হাজারিরা বেতের ধামা আর ঝোড়ায় প্রচুর ফল সাজিয়ে বসেছে। মর্তমান আর কাঁটালি কলা, গাছপাকা পেঁপে, কমলা, পেয়ারা, সবেদা, মাদার আর লকেট ফল। তা ছাড়া শসা, কমলা, টোপা কুল, ইত্যাদি। এ-সব তারা নিজেরা কিছু ফলায়, বাকিটা পাইকারের কাছ থেকে সস্তায় কিনে কিছু লাভ রেখে বিক্রি করে।

হাজারি বুড়ি আর চম্পা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খদ্দের সামলাচ্ছিল। হাজারির বয়স ষাট পেরিয়েছে, কিন্তু এখনও বেশ শক্তপোক্ত, মজবুত চেহারা। চম্পা ছাড়া জগৎ সংসারে তার কেউ নেই।

চম্পার বয়স সতেরো। অনেক সময় নামের সঙ্গে চেহারার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। যে ছেলে কুটকুটে কালো তার নাম হয়তো শুভ্রজ্যোতি। ওই যে পুরনো একটা কথা আছে—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, সেইরকম আর কি। কিন্তু চম্পা নামেও যা, রূপেও তাই। ফুলের মতোই ফুটফুটে। সারা শরীরে সোনালি চাঁপার আভা। ভরাট মুখে, ভাসা ভাসা চোখে সারাক্ষণ নিষ্পাপ হাসি লেগেই আছে। পরনে রঙিন শাড়ি, হাতে রুপোর বালা, গলায় রুপোরই বিছে, হার, নাকে লাল পাথর বসানো নাকফুল। ওকে দেখলে মন ভাল হয়ে যায়।

সত্যবান জানেন, হাজারি বুড়িরা থাকে এখান থেকে চার মাইল দূরের একটা গাঁ—গোপীগঞ্জে। চম্পা হাজারির একমাত্র সম্বল, আবার তাকে নিয়েই বুড়ির দিবারাত্রি দুশ্চিন্তা। দিনকাল রাতারাতি পালটে গেছে। মানুষ আর মানুষ নেই। চারদিকে পাল পাল হিংস্র জন্তুজানোয়ার। হাঙর, কামট, চিতা। একটু অসাবধান হলে আর রক্ষা নেই। তাই নাতনিকে চোখে চোখে রাখে হাজারি বুড়ি। কোথাও গেলে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। লহমার জন্যও চম্পাকে চোখের আড়াল করে না। সত্যবানকে অনেকবার সে বলেছে, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে সে শান্তি পায়। সব দুর্ভাবনার অবসান। কিন্তু পছন্দমতো ছেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। হুট করে সে যদি মরে যায়, কে দেখবে মেয়েটাকে? ইত্যাদি।

সত্যবানদের দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে হাজারি বুড়ি এবং তার নাতনি। অন্য খদ্দেরদের তাড়া লাগায়।—'আপনারা একধারে সরে দেঁড়ান দিকিন। বড়বাবারে আসতি দ্যান—আসেন বাবা, আসেন—'

সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছ হাজারি?'

'ভাল বাবা, আপনার ক্রেপায় (কৃপায়) ভাল আচি। খালি একডাই ভাবনা, চম্পিটারে পার করতি পারলে মরে সুক পাই—'

সত্যবান চম্পার দিকে তাকালেন।—'তাই তো, দিন দিন আরও সুন্দর হয়ে উঠছিস। তা এখনও বর জুটল না?'

চম্পার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ। চোখ নামিয়ে মিষ্টি গলায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। 'যাও, আমি ওসব ঝানি নে—'

হাজারি বুড়িকে কিছু বলতে হয় না। সত্যবানের পছন্দ অপছন্দ তার ভালই জানা। তাঁর হাত থেকে খালি ব্যাগটা নিয়ে সেরা সেরা ফলে ভর্তি করতে করতে হেসে হেসে বলে, 'বড়বাবা, আপনার আশীব্বাদে ভগমান অ্যাদ্দিনে মুখ তুলি চেয়েচে।'

সত্যবান রীতিমতো উৎসুক। বললেন, 'কিরকম?'

হাজারি বুড়ি জানায়, একটা চমৎকার সম্বন্ধ এসেছে চম্পার। রোজগেরে পাত্র। স্বাস্থ্যবান। রাজপুত্রের মতো চেহারা। প্রচুর টাকা কামায়। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের মতো। চম্পার সঙ্গে খুব ভাল মানাবে।

সত্যবান খুশি হলেন। চম্পার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা পাতানো দাদু এবং নাতনির। রগড়ের সুরে বললেন, 'এ হে, আমার কপালটাই খারাপ। এই পরীটা হাতছাড়া হয়ে গেল। তা সম্বন্ধটা হল কী করে?'

'এক দিদি এনিচে।'

'কে দিদি? তোমাদের কেউ হয়?'

'না না, কেউ হয় নে। আমাদের গাঁয়ের সব্বাই তারে দিদি বলে। আমিও বলি।' হাজারি বুড়ি সার্বজনীন দিদিটি সম্পর্কে যে সবিস্তার বিবরণ দিল তা এইরকম। তার নাম মমতা। বয়স কম করে চল্লিশ তো হবেই। থাকে কলকাতায়। মাস তিনেক হল হাজারিদের গ্রামে রকমারি জিনিস বেচতে আসছে। নতুন নতুন রঙিন শাড়ি, ব্লাউজ, স্নো, পাউডার, চুলের ফিতে, ক্লিপ, এমনি কত কিছু। সবই মেয়েদের পোশাক আশাক আর সাজসজ্জার উপকরণ। শুধু হাজারিদের গোপীগঞ্জেই না, চারপাশের অন্য গ্রামগুলোতেও সে মালপত্র নিয়ে যায়।

মমতা দিদি বড় ভালমানুষ। সারাক্ষণ মুখে হাসিটি লেগেই রয়েছে। ভারি মিষ্টি কথা বলে। মিশুকে। এলাম, শাড়ি বেচলাম, সাজের জিনিস বেচলাম, তারপর টাকাপয়সা গুনে নিয়ে চলে গেলাম—সে তেমনটি নয়। বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেচাকেনা তো করেই, সেই ফাঁকে সবার সঙ্গে গল্প করে, তাদের সুখদুঃখের খবর নেয়। বিপদে আপদে সাহায্য করে। এই তো কিছুদিন আগে হাজারিদের গ্রামের এক বুড়োর যায় যায় অবস্থা হয়েছিল। ডাক্তার যে ওষুধ লিখে দিয়েছে তা পাওয়া যাচ্ছিল না। কলকাতা থেকে ওষুধ এনে দিয়ে বুড়োকে সুস্থ করে তোলে মমতা। মোট কথা, মাত্র তিন মাসের মধ্যে এলাকার মানুষজনের হৃদয় জয় করে নিয়েছে সে।

সত্যবান চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'চম্পার সম্বন্ধের কথাটা বল—'

হাজারি বুড়ি আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'দিদি মানুষটা কেমন সিটি আগে ঝানায়ে দিতি হবে নি?'

অর্থাৎ মমতা সম্পর্কে স্পষ্ট একটা ধারণা তৈরি করে দেবার পর আসল প্রসঙ্গে আসতে চাইছে হাজারি। সত্যবান ঘাড়টা সামান্য হেলিয়ে বললেন, 'তা তো দিতেই হবে।'

হাজারি বলতে লাগল, 'হপ্তা দুই আগে একদিন দিদি আমারে শুদোয়, চম্পী তো বড়সড় ডাগরডোগর হয়ি উটেচে। ওর বে' দেবে নি? আমি দিদিরে বললুম, বে' তো দিতি হবে। চম্পীর চিন্তায় রাত্তিরি ভাল করে ঘুমুতি পারি না। কিন্তুন মনের মতোন পাত্তর (পাত্র) পাচ্চি না গো দিদি। দু-একটা সোম্বন্দ (সম্বন্ধ) যে আসচে নি তা লয়। কিন্তুন ছেইলেগুলো কেমন, কে ঝানে। আমাদের মাতার উপ্‌রি (ওপর) পুরুষ মানুষ লেই। আমি মেইয়েছেলে, তার উপ্‌রি এত বয়েস। আমি কি পারি ঘুরি ঘুরি পাত্তরদের খবর নিতি? ভয় হয়, বদ ছেইলের হাতে পইড়ে চম্পীটার জেবন লষ্ট না হইয়ে যায়। ভাবি, আমি চোক বুজলে মেইয়েটার কী হবে!'

হাজারি জানালো, সমস্ত শোনার পর মমতা তার একটা হাত ধরে আপনজনের মতো সহৃদয় সুরে বলেছে, তার জানাশোনা ক'টি সৎপাত্র আছে। মমতার যদি হাজারির ওপর আস্থা থাকে, সে চম্পার বিয়ের জন্য চেষ্টা করবে।

এ একেবারে আশাতীত। আকাশের চাঁদ যেন হাতের মুঠোয় নেমে এসেছিল। অভিভূত হাজারি ধরা ধরা গলায় বলেছে, মমতার ওপর তার অসীম ভরসা। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, মমতা এমন কিছু করবে না যাতে তাদের লেশমাত্র অনিষ্ট হয়। সে যে ছেলের সঙ্গে চম্পার বিয়ে দিতে বলবে তার হাতেই চম্পাকে তুলে দেবে হাজারি। মমতা খুশি। জিজ্ঞেস করেছে, চম্পার কোনও ফোটো আছে কিনা। অবাক হাজারি জানতে চেয়েছে, ফোটো দিয়ে কী হবে? মমতা বলেছে সে আগে পাত্রপক্ষদের ফোটো দেখাবে। ওদের কেউ চম্পাকে পছন্দ করলে মেয়ে দেখাতে নিয়ে আসবে। হাজারি কাঁচুমাচু মুখে বলেছে, তারা গরিবগুরবো মানুষ, ফোটো তোলাবে কোত্থেকে? অত পয়সা কোথায়? ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছে, ফোটো না থাকায় বিয়েটা কি হবে না? মমতা তখন ভরসা দিয়ে বলেছে, কোনও চিন্তা নেই। কলকাতা থেকে লোক নিয়ে এসে ফোটো তোলার ব্যবস্থা সে-ই করবে।

হাজারি বুড়ি সত্যবানকে আরও জানায়, শুধু চম্পাই না, গোপীগঞ্জ এবং তার আশপাশের গ্রামগুলোতে সুন্দরী কুমারী মেয়ে তো কম নেই। মমতা পরম শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো নিজের থেকে তাদের জন্যও পাত্র জোগাড় করে দিতে চেয়েছে। সেই মেয়েদের বাপ-মায়েদের চোখ জলে ভরে গেছে। কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবে, ভাবতে পারছিল না। মমতা ওই এলাকার বাসিন্দাদের কাছে যেন রক্তমাংসের মানুষ নয়—কোনও এক দেবীপ্রতিমা।

সেই যে মমতা ফোটোর কথা বলেছিল তার দু'দিন বাদে একটা ঝাঁকড়া-মাথা, গালভাঙা, ঢ্যাঙা চেহারার ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে ফের হাজির হল। সেই ছোকরা চম্পা আর অন্য মেয়েদের ছবি তুলল। মমতা পাত্রদের ফোটোও সঙ্গে করে এনেছিল। সব ক'টা ছেলেই দেখতে ভাল। তবে চম্পার জন্য যাকে ঠিক করা হয়েছে সে সত্যিই চমৎকার। ছবি দেখে হাজারি বুড়ি খুশিতে ডগমগ। চম্পার মুখচোখ দেখে মনে হয়েছে ছেলে তারও খুব পছন্দ। সে মনে মনে যে বরের স্বপ্ন দেখে, ফোটোর যুবকটি ঠিক তা-ই।

ফোটো তোলার সপ্তাহখানেক বাদে আবার এল মমতা। এবার যে সংবাদটি সে নিয়ে এসেছে তাতে গোপীগঞ্জ এবং তার পাশের হাঁসপুকুর, জালুকা এমনি তিন চারটে গ্রামের মানুষজনের সারা শরীরে শিহরন খেলে যায়। সত্যিই চাঞ্চল্যকর খবর। মোট চোদ্দটি মেয়ের ফোটো তোলা হয়েছিল। চোদ্দ জনকেই ছেলেদের পছন্দ হয়েছে। এই বিয়েতে কারওকেই পণ দিতে হবে না। এমনকি বিয়ের যাবতীয় খরচ পাত্রপক্ষরাই করবে। মেয়েপক্ষের একমাত্র কাজ কন্যাদান।

সমস্ত শোনার পর কপালে ভাঁজ পড়ে সত্যবানের। বললেন, 'কী বলছ হাজারি, রাতারাতি সত্যযুগ নেমে এল নাকি!'

হাজারি বুড়ি এতক্ষণ বিপুল উৎসাহে, প্রবল তোড়ে কথা বলে যাচ্ছিল। এবার হাঁ হয়ে যায়। সত্যযুগ ব্যাপারটা তার মাথায় ঢোকে নি। বিমূঢ়ের মতো সে তাকিয়ে থাকে।

সত্যবান বলতে লাগলেন, 'পণ নেবে না, রাজপুত্রের মতো পাত্র, নিজেরাই খরচ করে বিয়ে করবে—পশ্চিম বাংলা হঠাৎ স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠল দেখছি।'

হাজারি এবারও জবাব দিল না।

একটা বড় রকমের খটকা চোখা কাঁটার মতো সত্যবানকে অবিরল খোঁচা দিচ্ছে। বললেন, 'ক'টা কথার জবাব দাও তো হাজারি—'

'বলেন—'

'নিজের চোখে পাত্রগুলোকে তোমরা দেখেছ?'

'না বড়বাবা, ওই ঝা ফটোক (ফোটো) দেকিচি।'

'তাদের মা-বাবা বা অন্য কোনও আত্মীয়স্বজনকে?'

'না। মমতা দিদি বুলেচে, বে'র আগে আগে সব্বাইকে এনি আলাপ কইরে দেবে।'

'তা হলে তোমাদের ওই মমতাদিদির কথামতোই তোমরা ঠিক করে ফেলেছ, যাদের ফোটো সে দেখিয়েছে তাদের সঙ্গেই মেয়েদের বিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ, তাই তো ভেবিচি।'

সত্যবান বললেন, 'ছেলে দেখলে না, তার মা-বাপদের সঙ্গে আলাপ হল না, হট করে একেবারে বিয়ের কথা বলে ফেললে!'

বারকয়েক ঢোক গিলল হাজারি। খুশির ঝলমলে ভাবটা মুখ থেকে সরে গিয়ে সেখানে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল। বলল, 'মমতাদিদি ভাল নোক। আমাগের কতা কত ভাবে! কারও ক্ষেতি হয়, এমনটা সে করবে বলি তো মনে হয় না। তাই—'

তার কথার জবাব দিলেন না সত্যবান। সোজাসুজি হাজারির চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'পাত্ররা কোথায় থাকে, মমতাদিদি জানিয়েছে?'

'দিল্লি বোম্বাইতে। বড় বড় চাকরি করে।'

'তাদের মা-বাপেরা?

'কলকাতায় থাকে।'

একটু চুপ করে থেকে কী ভাবলেন সত্যবান। তারপর বললেন, 'এরপর কবে আসবে তোমাদের মমতাদিদি?'

হাজারি বলল, 'আসচে হপ্তায়। বে'র দিনক্ষ্যাণ ঠিক করতি। দিদি চাইচে একদিনেই চোদ্দটা মেইয়ের বে' হয়ি যাক।'

'বুঝলাম। দিদি এলে তাকে পাত্রদের আর তাদের মা-বাপদের নাম ঠিকানা লিখে দিতে বলবে। সেগুলো আমাকে দেবে। আগে আমি সব দেখি, খোঁজখবর নিই। তারপর বিয়ের কথা ভেবো।'

'কেন বড়বাবা, দিদি ঝে সোম্বন্দ (সম্বন্ধ) এনিচে তার মদ্যি কুনো গণ্ডগোল আচে?' 'হাজারি বুড়ির গলা কেঁপে যায়। 'চম্পীর কিচু হলি আমি বাঁচব নি।'

'আহা, এত ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি তো আছি। তোমাকে যা বললাম সেটা কর।' বলতে বলতে সত্যবানের চোখ চম্পার দিকে চলে যায়। মেয়েটার মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। খানিক আগে তার ভেতর থেকে খুশি যেন উপচে বেরিয়ে আসছিল। লহমায় সব উধাও। একটা স্বপ্নের ঘোরে ছিল সে, সেটা মুছে গেছে।

দু'পা এগিয়ে চম্পার চিবুকে আলতো করে আদরের ভঙ্গিতে একটা টোকা দিলেন সত্যবান। নরম গলায় বললেন, 'ভাবিস না। তোর খুব ভাল বিয়ে হবে।'

তারপর মানিব্যাগ থেকে ক'টা নোট বার করে হাজারি বুড়িকে দিতে দিতে বললেন, 'তোমার জিনিসের দামটা নাও।'

এই বাজারের মাছওলা বা সবজিওলাদের মতো হাজারি বুড়িও মুখ ফুটে সত্যবানের কাছে দাম টাম চায় না। সে জানে, আসল যা দাম তার চেয়ে অনেক বেশিই পেয়ে যাবে।

বাজার হয়ে গিয়েছিল। ভয়ে দুর্ভাবনায় কুঁকড়ে-যাওয়া হাজারি বুড়িকে আরও একবার ভরসা দিয়ে তেঁতুলতলায় চলে এলেন সত্যবান আর রজত। মথুরানাথরা উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে আছেন।

চটের ব্যাগ থেকে চারা পোনায় বোঝাই প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট বার করে প্রথমে মথুরানাথকে দিলেন সত্যবান। রজতের এক হাতে সবজির ব্যাগ, আরেক হাতে ফলের। মথুরানাথ চলে যাচ্ছিলেন, সবজির ব্যাগের দিকে আচমকা তাঁর নজর পড়ল। ফুলকপি দেখে তাঁর চোখ চকচকিয়ে ওঠে। বললেন, 'এ বছরের নতুন আনাজ। একদম টাটকা। এখনও শিশির আর মাটি লেগে আছে।'

তাঁর অন্তরের বাসনাটি গোপন নেই, ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। সত্যবান রজতকে বললেন, 'মথুরাবাবুকে একটা কপি দে—'

তারপর গঙ্গাধর এবং ভবতারণও তাদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিল। মাছের প্যাকেটের সঙ্গে একটা করে ফুলকপি কৌশলে আদায় করল।

বাকি রইলেন ভানুমতী ভট্টাচার্য। যখনই আসেন হাতে একটা মোটা কাপড়ের মাঝারি থলে থাকে। তিনি বিধবা মানুষ, মাছমাংসের ছোঁয়া থাকলে সে জিনিস কখনও নেবেন না।

সত্যবান মাছ কেনার সময় সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। সেই হাতে ভানুমতীকে ফলটল দিতে পারেন না। ফলের ব্যাগটা রয়েছে রজতের কাছে। সত্যবান তাঁকে বললেন, 'দিদির থলেতে দু'টো পাকা পেঁপে, চারটে আপেল, ছ'টা শসা আর মর্তমান কলাগুলো দিয়ে দে। একটা কপিও দিবি।'

ভানুমতী তাঁর থলের মুখ খুলে ধরেছেন। রজত ক্ষিপ্র হাতে ফলের ব্যাগ থেকে আপেলটাপেল বার করে থলেতে ঢোকাতে লাগল।

সত্যবান ভানুমতীকে জিজ্ঞেস করেন, 'ছেলেমেয়েরা এর মধ্যে দেখা করতে এসেছিল?'

মুখচোখ বিষাদে ভরে যায় ভানুমতীর। মাথাটা ডান দিক থেকে বাঁয়ে, বাঁ দিক থেকে ডাইনে আস্তে আস্তে নাড়তে নাড়তে আবছা গলায় বললেন, 'না—'

'কতদিন হল তারা আসে না?'

এক লহমা সত্যবানের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন ভানুমতী। বললেন, 'বছর দেড়েক।'

'কেউ তো আর মঙ্গলগ্রহে থাকে না। কলকাতা এখান থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার রাস্তা। দেড় বছরের ভেতর তারা একবার মাকে দেখতে আসতে পারল না? আশ্চর্য!' একটু থেমে ফের বলেন, 'কী এমন রাজকার্য করে যে দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হয়?'

ভানুমতী চুপ করে থাকেন।

'তারা খোঁজ নেয় না। অথচ তাদের মঙ্গলের জন্যে মাসে দু'দিন করে উপোস করে চলেছেন! একটা কথা শুনে রাখুন—'

ভানুমতী এবারও নীরব।

সত্যবান বললেন, 'যে-সব রত্ন পেটে ধরেছেন, আপনার মৃত্যুর খবর পেলেও তারা আসবে কিনা সন্দেহ।' তাঁর চোখেমুখে এবং গলার স্বরে তীব্র বিরক্তি এবং অসন্তোষ ফুটে বেরোয়।

ফল টল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। চোখ তুলে শুকনো, বিষণ্ণ মুখে একবার সত্যবানের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সোনাডাঙা বাজারের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে ওধারের ছোট শহরটার দিকে চলে গেলেন ভানুমতী।

সত্যবান বললেন, 'চল, ফেরা যাক—'

সত্যবান তাঁর সাইকেলের ক্যারিয়ারে মাছ আর সবজির ব্যাগ দু'টো শক্ত করে বেঁধে নিলেন। ফলের ব্যাগটা রজত তার সাইকেলের ক্যারিয়ারে বাঁধল। তারপর দু'চাকার বাহন দু'টো পাশাপাশি রাজানগরের দিকে দৌড় শুরু করল।

পাঁচ

সাইকেল চালাতে চালাতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। এতক্ষণ সোনাডাঙা বাজারে জিনিসপত্র কেনাকাটা, নানা লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা, এ-সবে ডুবে ছিলেন। ফের সেই ভাবনাগুলো মাথার ভেতর ঢুকে পড়েছে। গাল-কাটা গাব্বারা সনেকপুরের জলা বুজিয়ে দিচ্ছে। তাদের পেছনে নাকি পলিটিক্যাল পার্টি রয়েছে। ওদিকে মমতা নামে একটি মেয়েমানুষ আচমকা গোপীগঞ্জে উদয় হয়ে চম্পা এবং আরও অনেকগুলো মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। এ-বিয়েতে পণ লাগবে না, একটা পয়সা খরচা হবে না। খুব গোলমেলে ব্যাপার। অস্বস্তি হচ্ছে সত্যবানের, ভীষণ অস্বস্তি।

মিনিট কুড়ির ভেতর রাজানগরে পৌঁছে গেলেন দু'জনে। 'শান্তিনিবাস'-এর সামনে এসে সাইকেল থামল। সিট থেকে নামতে নামতে সত্যবানের চোখ কোনও স্বয়ংক্রিয় নিয়মে রাস্তার ওপাশের তেতলা বাড়ির জানালার দিকে চলে গেল। ভোরবেলার মতো রিনি দাঁড়িয়ে আছে। অন্য দিন প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরে এলে তাকে দেখা যায় না। তার মানে আজ সে ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যায় নি।

ভাবনার প্রক্রিয়াটা এলোমেলো হয়ে গেল সত্যবানের। গাল-কাটা গাব্বাদের ঠেলে সরিয়ে রিনিরা ঢুকি পড়ল তাঁর মাথায়।

রজতও নেমে পড়েছিল। ক্যারিয়ার থেকে ফলের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে বলল, 'জেঠু, আমি চললাম—'

রজত ফের সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল, সত্যবান হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন। খেয়াল হল, এই রিনির জন্যই তিনি রজতকে আজ কলেজে যেতে দেন নি। বললেন 'ওয়েট ওয়েট। জাস্ট ফাইভ মিনিটস তোকে আটকে রাখব। তারপর ছুটি।'

'ওকে। কী করতে হবে বলুন—'

রজতের কথার উত্তর না দিয়ে সত্যবান পালটা প্রশ্ন করলেন, 'তোদের ব্যাপারটা এখন কোন স্টেজে রয়েছে?'

রজত অবাক। সত্যবান কী জানতে চাইছেন, বুঝতে না পেরে বলল, 'মানে?'

উলটো দিকের তেতলায় রিনির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন সত্যবান।—'ওই মেয়েটার সঙ্গে তোর একটা রিলেশন তৈরি হয়েছে, না? সেটা কতদূর এগিয়েছে, শুনতে চাইছি।'

রজত হকচকিয়ে যায়। তোতলাতে তোতলাতে বলে, 'কি-কিসের রি-রি-রিলেশন?'

চোখ পাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়েন সত্যবান।—'তোর মতো লেটলতিফ, আটটার আগে যে বিছানা ছাড়তে চায় না, তার হঠাৎ কেন প্রাতর্ভ্রমণের নেশা চাগাড় দিয়ে উঠল আর ভোরে যখনই তুই 'শান্তিনিবাস'-এর সামনে চলে আসিস সেই মাহেন্দ্রক্ষণে কেনই বা ওধারের তেতলা বাড়িটার জানালায় একটি সুইট বিউটিফুল ইয়াং লেডি দাঁড়িয়ে থাকে—এসব তো কঠিন কোনও অঙ্ক নয়, সিম্পল অ্যারিথমেটিক।'

রজতের মুখে বোকাটে হাসি ফোটে। গাল চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'ধরে ফেলেছেন তা হলে—'

'তা তো ফেলেছিই, কিন্তু বাঘের গুহায় যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছ বাপু—'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে রজত। তার মুখ থেকে আস্তে আস্তে হাসি মিলিয়ে যায়। সে চুপ করে থাকে।

সত্যবান ভুরু নাচাতে নাচাতে বললেন, 'তোর বাবা মনোতোষ আর রিনির বাবা বিনায়কের মধ্যে সম্পর্কটা তো খুবই মধুর। পারলে একজন আরেকজনকে ছিঁড়ে খায়। কতদিন ধরে বাঁদর দু'টো যেন মামলা লড়ে যাচ্ছে?' সত্যবান খুব ছেলেবেলা থেকে বিনায়ক আর মনোতোষকে চেনেন। ওঁদের সঙ্গে তাঁর যা সম্পর্ক তাতে বাঁদর, উল্লুক বলতেই পারেন।

'আপনি তো জানেনই, দশ বছর পার হয়ে এগারো বছরে পড়েছে।'

'এগারো বছর ধরে মাটাডরদের মতো ফাইট চালানো সোজা ব্যাপার নয়। কিন্তু বিনায়ক যদি জানতে পারে তুই তার মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিস, তোকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।'

রজত একটু চুপ করে থেকে বলল, 'একটা কাজ অবশ্য আমরা করতে পারি। আপনি কী বলেন?'

'কী কাজ আগে শোনা, তারপর তো ওপিনিয়ন দেব—'

'আমরা অ্যাডাল্ট। রিনির ফাইনাল পরীক্ষাটা হয়ে গেলে স্ট্রেট ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে বিয়েটা করে ফেলা যায়।'

ডান হাতের তর্জনী উঁচু করে, জোরে জোরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, গমগমে গলায় সত্যবান বললেন, 'নো—নো—নো—'

কী বলতে গিয়ে থতমত খেয়ে থেমে গেল রজত।

সত্যবান বলতে লাগলেন, 'এই বিয়েটা হলে রাজানগরে স্ক্যান্ডালটা কিরকম রটবে, ভেবে দেখেছিস?'

এই দিকটা আগে ভেবে দেখেনি রজত। রিনিকে নিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে সে।

সত্যবান বলতে লাগলেন, 'তোদের দুই বাপের মধ্যে চরম শত্রুতা। দু'জনের মল্লযুদ্ধ চলছে কোর্টে। আর ছেলেমেয়ে কিনা লুকিয়ে বিয়ে করে বসল। বিনায়ক আর মনোতোষ রাজানগরের রেসপেক্টবেল সিটিজেনস। ভেরি মাচ এস্টাব্লিশড। তোদের জন্যে ওদের গালে চুনকালি লেগে যাবে। লোকে হ্যা হ্যা করে হাসবে। মানুষ কেচ্ছার গন্ধ পেলে হামলে পড়ে।'

রজত দিশেহারা হয়ে পড়ল। এবাবও উত্তর দিল না।

সত্যবান বলেন, 'মা-বাপের অসম্মান হয়, তোদের মতো শিক্ষিত ছেলেমেয়ের কী তা করা উচিত?'

ঢোক গিলে রজত এবার বলে, 'তা হলে কী করা যায়?'

একটু নীরবতা।

তারপর সত্যবান রজতের কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধ গলায় বললেন,' ঠিক আছে। তোদের ব্যাপারটা আমি দেখব। দুই বুল-ফাইটার বিনায়ক আর মনোতোষকে কিভাবে বুঝিয়েসুঝিয়ে প্রবলেমটার সলিউশন করা যায় সেটা ঠিক করতে হবে। ঘাবড়াও মাত।' ভোরে প্রাতর্ভ্রমণে বেরুবার সময় আবছাভাবে সংকেত পেয়েছিলেন রিনি আর রজত যে সমস্যা পাকিয়ে তুলেছে তাতে তাঁকে নাক গলাতে হবে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে এর ভেতর ঢুকে পড়তে হবে, ভাবা যায়নি।

এদিকে রজতের মুখে ঝলমলে হাসি ফুটে বেরিয়েছে। 'মেজরসাহেব যখন দায়িত্ব নিয়েছেন, আমাদের টেনশন কেটে গেল। যাচ্ছি—' চটপট সাইকেলে উঠে পড়ে সে।

ছয়

যেদিন সত্যবান বাজার করে ফেরেন, বাড়ির সবাই হই হই করতে করতে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। আজও এল। লক্ষ্মী, তার ছেলে নাটু, তাছাড়া আরও দু'টো ছেলে—শিবু এবং ফতু। শিবুর বয়স বারো-তেরো, রোগাপটকা, একটা পা পোলিওতে সরু হয়ে গেছে, ক্রাচে ভর দিয়ে তাকে হাঁটতে হয়। ফতুর বয়স আট কি নয়। সে বোবা এবং কালা, হাবলা ধরনের। বোধবুদ্ধি তেমন নেই। চোখদু'টো একটু অস্বাভাবিক। বেশ খানিকটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

লক্ষ্মীদের মতো শিবু আর ফতুরও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই। শিবু একটা লাঠিতে ভর দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করত। সত্যবান তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে ক্রাচ কিনে দিয়েছেন। তাকে এখন আর দু'মুঠো ভাতের জন্য লোকের কাছে হাত পাততে হয় না। নিরাপদ, নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে গেছে সে। সত্যবান তাকে বাড়িতে টিউটর দিয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। ছেলেটার মাথা পরিষ্কার। কোনও কিছু একবারের বেশি দু'বার বোঝাতে হয় না, চট করে ধরে ফেলে। সত্যবান ভেবে রেখেছেন, আপাতত এইভাবে চলুক, পরে প্রাইভেটে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক দিক। শিবু চাইলে তারপরও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে।

শিবুকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া যেত। কিন্তু ছেলে-ছোকরারা ভীষণ নিষ্ঠুর। বিকলাঙ্গ, পঙ্গু কারওকে দেখলে ঝাঁক বেঁধে তার পেছনে লেগে, 'ল্যাংড়া' বা 'কানা' বলে বলে অতিষ্ঠ করে তোলে। এ এক নির্মম আমোদ।

ফতুকে পাওয়া গিয়েছিল অদ্ভুতভাবে। রাজানগর থানার ওসি নিরঞ্জন মাইতি সত্যবানকে খুবই শ্রদ্ধা করেন। মাসতিনেক আগে হঠাৎ একদিন ফোন করে জানালেন, একটা ছেলেকে নিয়ে তাঁর কাছে আসছেন। ফতুকে সঙ্গে করে কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি হাজির। বললেন, 'ছেলেটা রাজানগর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে ছিল। ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব। জড়ভরত টাইপের। কোথায় বাড়ি, কে বাপ, কে মা, আচমকা কোত্থেকে এখানে এল, কিছুই জানি না। সবাই ফতু ফতু করে ডাকছিল।' অর্থাৎ নামধাম পরিচয়হীন ছেলেটাকে স্টেশনের লোকজন ওই নতুন নামটি দান করেছে।

সত্যবান জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'একে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন কেন?'

'স্যার, ফতুকে আমরা কোনও হোমে পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু বেশির ভাগ হোমের ম্যানেজমেন্ট ভাল ব্যবহার করে না। এই ধরনের ছেলেদের ওপর ভীষণ টরচার হয়। আপনি তো অনেককে শেলটার দিয়েছেন। তাই—'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছেন সত্যবান। মজা করে বলেছেন, 'আমার বাড়িটা আপনারা অনাথ আশ্রম ভেবে ফেলেছেন দেখছি। ঠিক আছে, ছেলেটা এসেই যখন পড়েছে—থাক।' সেই থেকে ফতু রয়ে গেল। সত্যবানের সংসার আরও একটু বাড়ল।

এদিকে নাটু আর লক্ষ্মী বাজারের ব্যাগগুলো তুলে নিয়েছে। দারোয়ান বগুলা সিংও তাদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। শিবুরও ইচ্ছে, কিছু একটা বয়ে নিয়ে যায় কিন্তু ক্রাচ সামলে সেটা সম্ভব নয়। তবু সে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'আমাকে কিছু দাও, আমাকে কিছু দাও—'

সস্নেহে ধমক দিলেন সত্যবান, 'নিজেই ঠেকনো ছাড়া ঠিকমতো খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তার ওপর মাল টানতে চাইছে! হুমড়ি খেয়ে পড়লে অন্য ঠ্যাংটারও বারোটা বেজে যাবে। যা যা—সর—'

সত্যবানকে যখনই দেখে, দুই হাত নিজের বুকের কাছে মুঠো পাকিয়ে হিহি করে কাঁপতে থাকে ফতু। খুশিতে, উত্তেজনায় তার মুখে অদ্ভুত হাসিও ফোটে। হাসির তোড়ে গালের মাংস ঠেলে উঠে চোখ বুজে আসে। অনেক কিছু বলতে চায় সে, কিন্তু গলার ভেতর থেকে অস্পষ্ট ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ বেরোয় শুধু।

ফতু জড়বুদ্ধি, হাবাগোবা হলেও হয়তো বুঝতে পারে ওই লম্বাচওড়া বিপুল চেহারার মানুষটা তার ত্রাণকর্তা। সত্যবানের জন্য সে চার বেলা খেতে পাচ্ছে, ভাল জামা-প্যান্ট পরতে পাচ্ছে, আরামে থাকতে পারছে।

সত্যবান ফতুর কাঁধে হাত রাখলে তার গলা আরও ঘড়ঘড়ে হয়ে যায়। সে তাঁর উরুর কাছটা আঁকড়ে ধরে। এভাবেই বুঝিবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় ছেলেটা। এ-জাতীয় ছেলেমেয়ের বাড়তি একটা ইন্দ্রিয় থাকে। তারা বুঝতে পারে, কে ভাল, কে মন্দ। সেইভাবেই ফতু টের পায় সত্যবান তার কত বড় হিতাকাঙ্ক্ষী।

সত্যবান অপার মমতায় ফতুকে বলেন, 'হয়েছে—হয়েছে। এবার আমাকে ছাড়—'

ফতু কী বুঝল, সে-ই জানে। সত্যবানের উরুটা ছেড়ে দিল।

সবাই প্রায় মিছিল করে বাড়ির ভেতর চলে আসে। সত্যবান লক্ষ্মীকে বললেন, 'নুলবুলিটার জন্যে থানকুনি এনেছি। ওটার আমাশার ধাত। ওর জন্যে

আলাদা করে থানকুনি দিয়ে মাছের ঝোল করবি। চ্যালারামকে ব্রাহ্মী শাক ভেজে দিস। সামনে ওর পরীক্ষা। মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। বগুনিটাকে কালবোস মাছের মুড়োর আধখানা দিস। ও মুড়ো খেতে ভালোবাসে।' তিনি নাটুদের নতুন নতুন নামকরণ করেছেন। নাটু হল চ্যালারাম, শিবু হল নুলবুলি আর ফতু—বগুনি। লক্ষ্মীকে আর কিছু বললেন না। কার কী পছন্দ-অপছন্দ, সব তার জানা। সেইমতো নানা পদ রাঁধবে। সে তো দশভুজা। সমস্ত দিকে তার খেয়াল।

লক্ষ্মীরা একতলার কিচেনের দিকে গেল। সত্যবান বাগানের ভেতর দিয়ে ওধারের চওড়া বারান্দায় উঠে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় চলে এলেন। জুতো বাইরে খুলে নিজের বেডরুমে ঢুকে একটা লম্বা ইজি চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন।

অনেকটা রাস্তা সাইকেল চালিয়েছেন, নানা লোকজনের সঙ্গে প্রচুর কথা বলেছেন, তাছাড়া ভেতরে ভেতরে চাপা টেনশন ছিল। এখন রীতিমতো ক্লান্তি বোধ করছেন। স্নায়ুমণ্ডলী কেমন যেন শিথিল হয়ে আসছে। ক'বছর আগে এর দশগুণ দৌড়ঝাঁপ করলেও শরীরে এতটুকু ছাপ পড়ত না। তাঁর অফুরান এনার্জি থাকত একই রকম অটুট। আজকাল মাঝে মাঝেই টের পাচ্ছেন, বয়স হয়েছে। চোরা বানের মতো ভেতরে ভেতরে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে।

মিনিট কুড়ি ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে থাকার পর উঠে পড়লেন সত্যবান। ক্লান্তি কেটে গেছে অনেকখানি। শরীর ফের আগের মতোই তরতাজা। তিনি সোজা বাথরুমে চলে গেলেন।

রোজ প্রাতর্ভ্রমণের পর বাড়ি ফিরে কিছুক্ষণ জিরিয়ে স্নান সেরে নেন। এটা তাঁর বরাবরকার অভ্যাস।

শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস সত্যবান গরম জল-ঠান্ডা জল মিশিয়ে স্নান করেন। তিনি গিজার চালিয়ে দিলেন।

বাথরুমেই তাঁর বাড়িতে পরার কয়েক প্রস্থ পোশাক থাকে। হাফহাতা পাঞ্জাবি, লুঙ্গি, শার্ট ইত্যাদি। স্নান সেরে পোশাক পালটে বেডরুমে ফিরে এলেন সত্যবান। চুলটুল আঁচড়ানো সবে শেষ হয়েছে, লক্ষ্মী ঘরে ঢুকল। তার হাতে মস্ত ট্রেতে কয়েকটা প্লেটে রয়েছে ব্রেকফাস্ট। একটা প্লেটে টুকরো টুকরো পেঁপে আপেল শসা কলা। একটা প্লেটে কড়া করে সেঁকা দু'টো টোস্ট, আরেকটায় ওমলেট। তাছাড়া চায়ের সরঞ্জাম। একটা খালি কাপও আছে। লক্ষ্মী চা করে আনে না। আলাদা আলাদা করে লিকার চিনি এবং দুধ নিয়ে

আসে। ব্রেকফাস্ট সেরে চা'টা নিজের হাতে তৈরি করে নেন সত্যবান। ট্রেতে ভাঁজ করা দু'টো খবরের কাগজও থাকে—একটা বাংলা, একটা ইংরেজি।

চুল আঁচড়ানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। চিরুনিটা ড্রেসিং টেবলের একধারে রাখতে রাখতে নিজের অজান্তেই বাঁ দিকের দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চোখ চলে গেল সত্যবানের। এখন কাঁটায় কাঁটায় ন'টা। এত বছর এ-বাড়িতে আছে মেয়েটা। একটা দিনও সময়ের হেরফের হয়নি। ওর মাথায় বুঝিবা অদৃশ্য কম্পিউটার বসানো আছে। কখন কী করতে হবে, সেটা ওকে নির্ভুলভাবে জানিয়ে দেয়।

ইজি চেয়ারটার পাশেই রয়েছে একটি লম্বাটে, নিচু টেবল। লক্ষ্মী ট্রে নামিয়ে রেখে চলে গেল। তার এখন নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। ঠিকে কাজের লোক আছে দু'টো। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তারা এসে গেছে। ওদের দিয়ে একতলা দোতলার সব ঘর-বারান্দা সাফ করাতে হবে। সাড়ে বারোটার ভেতর রান্নাবান্না শেষ করতে হবে। তার কি দাঁড়িয়ে থাকলে চলে!

ইজি চেয়ারে বসে পড়লেন সত্যবান। রোজ এখানে বসেই তিনি ব্রেকফাস্ট করেন।

খেতে খেতে প্রথমে বাংলা কাগজটা খুলে পড়তে লাগলেন। আজকাল খবরের কাগজে তেমন কিছু থাকে না। রোজই প্রায় এক ধরনের সংবাদ। খুনজখম, অ্যাকসিডেন্ট, ধর্ষণের ছড়াছড়ি। পলিটিক্যাল পার্টিগুলো একেকটা যেন কুস্তির আখড়া। নিজেদের মধ্যেই এর গ্রুপের সঙ্গে ওর গ্রুপের খেয়োখেয়ি, চুলোচুলি। আসলে ক্ষমতা দখলের লড়াই। তাছাড়া এক পার্টির সঙ্গে অন্য পার্টির মারদাঙ্গা, বোমাবাজি, বন্দুকবাজি লেগেই আছে। এর ওপর প্রোমোটাররাজ। প্রতিটি প্রোমোটার কোনও না কোনও পার্টির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আছে। ফলে সেখানেও নতুন নতুন রণক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। গুলি চলছে মুহুর্মুহু, লাশ পড়ছে ফটাফট। অন্যদিকে ফিল্মের নায়িকাদের, নানা কোম্পানির মডেলদের আধ-ন্যাংটো ছবির একজিবিশন। কে কত নিজের শরীর খুলেমেলে দেখাতে পারে, এই মেয়েদের মধ্যে যেন তারই জন্য দাঁতে দাঁত চাপা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর থাকে কত রকমের যে স্ক্যান্ডাল! গোপন ক্যামেরায় ধরা রাজনৈতিক নেতাদের কুকীর্তি, চল্লিশ হাজার টাকা মাইনের আমলার একশো কোটি টাকার প্রপার্টি। কোনও কোনও জননায়ক নিষ্কলঙ্ক ইমেজ নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আলো করে আছেন, হঠাৎ ফাঁস হয়ে গেল গোপন মধুচক্রে উদ্দাম যুবতীদের শরীর থেকে আনন্দ লুট করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন। এমন এক অবস্থায় যখন মেয়েদের গায়ে এক টুকোর সুতোও নেই। প্রমোদে দেহমন ঢেলে

দিতে গিয়ে শেষরক্ষা করা যায়নি। দু'চারটে গোঁয়ার, একরোখা সাংবাদিক থাকে যারা মণিমুক্তোর মতো এ-জাতীয় কেচ্ছা খুঁজে খুঁজে বার করে এনে দুনিয়াকে জানিয়ে দেয়।

খবরের কাগজের পাতায় পাতায় এখন শুধু সেক্স, কেলেঙ্কারি, মার্ডার, রাজনৈতিক প্যাঁচ কষাকষি। একই ধরনের খবর রোজ পড়তে পড়তে কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগে। সত্যবানের মনে হয়, পৃথিবীটা আর সুস্থ নেই। বিকৃত, পচাগলা, আবর্জনায়-ভরা নরককুণ্ড হয়ে উঠেছে।

ইংরেজি কাগজগুলোর হালও একই রকম। তবে সেক্স-টেক্সের সঙ্গে বিদেশের ভাল কিছু খবরও থাকে।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার চা বানিয়ে নিলেন সত্যবান। তাঁর ব্লাড সুগার নেই। চায়ে মাপা এক চামচ চিনি খান।

কাপে একটি চুমুক সবে দিয়েছেন, মোবাইল ফোন বেজে উঠল। লক্ষ্মী যেমন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে খাবারদাবার দিয়ে যায়, তেমনি ব্রেকফাস্টের সময় এই ফোনটা আসে। অনিবার্য কোনও নিয়মে।

মোবাইল তুলে নিয়ে কলার'স আইডেন্টিটি বুঝে নিয়ে সত্যবান বললেন, 'বল বন্দনা—'

ওধার থেকে বন্দনা বললেন, 'নতুন করে কী আর বলব। রোজ তোমাকে জিজ্ঞেস করি আমার এখানে কবে আসছ? রোজই বল, কাল যাব কি পরশু যাব। কিন্তু আসো আর না। আজও সেই প্রশ্নটাই করছি—'

সত্যবান জানেন, বন্দনার ষাট চলছে। কিন্তু এই বয়সেও তাঁর কণ্ঠস্বর কিশোরীদের মতো মিষ্টি এবং সতেজ। জলতরঙ্গের ঝংকারের মতো শোনায়।

বন্দনার ফোন এলে সত্যবানের মতো দাপুটে ফৌজি অফিসারও থতিয়ে যান। মিনমিনে গলায় বলেন, 'নানা কাজে জড়িয়ে পড়েছি। ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারিনি। মানে—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বন্দনা বললেন, 'তুমি খুব কাজের মানুষ, আমি জানি। কিন্তু আমার কাছে আসাটা বুঝি বিরাট অকাজ?'

সত্যবান হকচকিয়ে গেলেন।—'আমি কি কখনও তা বলেছি?'

'না, বলনি। কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছ—'

সত্যবান বললেন, 'না, না, এটা তোমার ভুল ধারণা।'

'তুমি তো জানো, আলিপুরের এত বড় বাড়িতে আমি একা থাকি।'

'জানি বইকি।'

'ববি সেই যে লন্ডনে চলে গেছে, তারপর ক'দিন আমার খোঁজ করেছে! লাস্ট ইয়ারের ডিসেম্বরে নিজের থেকে শেষ ফোন করেছিল। কিভাবে যে আমার সময় কাটে!'

ববি বন্দনার ছেলে। একমাত্র সন্তান। ববির অন্য একটা জমকালো নামও রয়েছে—সৌম্যদীপ বাসু। বেশ কয়েক বছর আগে সে লন্ডনে চলে যায়। তারপর একবার মাত্র কলকাতায় এসেছিল। ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করেছে। ওখানকার ন্যাশনালিটি নিয়ে সে এখন ব্রিটিশ নাগরিক।

চকিতে নিজের ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ে যায় সত্যবানের—রাহুল আর কাবেরী। একজন আছে আমেরিকায়, একজন কানাডায়। ববির মতো তারাও আর দেশে ফিরবে না। হঠাৎ কখনও, ছ'-আট মাস পর, তাদের ফোন আসতে পারে। ব্যস, এই পর্যন্ত।

রাহুলদের কথা ভাবতে ভাবতে ভানুমতী ভট্টাচার্যের মুখটা চোখের সামনে ফুটে ওঠে। সোনাডাঙা বাজারের পাশে তেঁতুল গাছের নিচে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিষণ্ণ, নিষ্প্রাণ। তাঁর ছেলেমেয়েরা পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটার দূরে কলকাতায় থাকে, অথচ মাকে দেখতে আসে না—এই নিয়ে ভানুমতীকে খোঁচা দিয়ে কিছু বলেছিলেন। তখন রাহুলদের কথা খেয়াল ছিল না। এই মুহূর্তে মনে হল, তিনি বন্দনা আর ভানুমতী একই ভূমিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। সন্তানরা আছে, আবার নেই। দূরে, বহু দূরে কোনও অচেনা গ্রহে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে।

বন্দনা ফের বললেন, 'আমিই তোমাকে হ্যাংলার মতো রোজ ফোন করি।'

সত্যবান অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। আবছা ভাবে গলার ভেতর দুর্বোধ্য একটা শব্দ করেন।

বন্দনা থামেন নি, 'বাড়িতে ক'টা কাজের লোক ছাড়া আর কেউ নেই। আই অ্যাম আ লোনলি উম্যান। একেক সময় নিঃসঙ্গতা আমার গলা টিপে ধরে।'

তেমন কোনও রাখঢাক নেই, যা জানাবার প্রায় খোলামেলা করেই তার ইঙ্গিত দিতে চাইছেন বন্দনা। এর আগেও বহুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সংকেত দিয়েছেন। প্রবল অস্বাচ্ছন্দ্য সত্যবানকে ঘিরে ধরতে থাকে। কিন্তু মুখচোখে বা কণ্ঠস্বরে তা বেরিয়ে আসতে দিলেন না। হালকা গলায় বললেন, 'আরে বাবা, আমিও তো একজন লোনলি ম্যান। নিঃসঙ্গ লোকেরা কি—'

তাঁকে শেষ করতে দিলেন না বন্দনা। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'লোনলি হলে কী হবে, সারাক্ষণ তোমার পেছনে ক্রাউড ঘুরছে। ওয়েটল্যান্ডস, মাইগ্রেটরি বার্ডস, এনভায়রনমেন্ট—তুমি তো সমস্ত কিছুর রক্ষাকর্তা। কতরকম

কাণ্ডকারখানার সঙ্গে জড়িয়ে আছ। লোনলিনেস ব্যাপারটা যে কী ডিসট্রেসিং তুমি কি ফিল করতে পার? আই ডোন্ট থিংক সো—'

কণ্ঠস্বর তরল করলেন সত্যবান, 'আহা, তুমিও একটা ক্রাউড জুটিয়ে ফেল না! ওয়ার্ল্ডে কাজের কি অভাব আছে? কোনও একটার ভেতর ইনভলভড হয়ে যাও। লাইফের বেশির ভাগটাই তো শেষ হয়ে এসেছে। দেখবে, বাকি দিনগুলো চমৎকার কেটে যাবে।'

'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবার মতো ইচ্ছে বা শখ কোনওটাই আমার নেই। নিজের সুখ, নিজের আনন্দের বাইরে একটা পা ফেলতেও আমি রাজি না।'

এই হল বন্দনা। নিজেকে ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না, বা বুঝতে চায় না। যা তার কাম্য সেটুকু পেলেই সে খুশি। কিংবা বলা যায়, সেটুকু যেভাবে হোক আদায় করে নিতে চায়।

বন্দনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কবে? সব মনে আছে সত্যবানের। স্মৃতির পেটরা খুলে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে কত যে ঘটনা!

বন্দনা বাগবাজারের এক বনেদি বংশের মেয়ে। তারা ছ'সাত পুরুষ এই শহরের বাসিন্দা। বিরাট কমপাউন্ডের ভেতর ওদের থামওলা বিশাল তেতলা বাড়ি; প্যালেসই বলা যায়। ছিল গোটা তিনেক পুরনো এবং নতুন মডেলের গাড়ি। আধ ডজন চাকরবাকর। ওঁদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাড়িতে প্রচুর লোকজন। সব মিলিয়ে জমজমাট ব্যাপার।

বন্দনার দাদা অরুণাভ ছিলেন সত্যবানের সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু। তাঁরা একই কলেজে পড়তেন, দু'জনের একই সাবজেক্ট। কফি হাউসে আড্ডা, একসঙ্গে সিনেমা দেখা, ছুটিতে দার্জিলিং কি সিমলা বা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অরুণাভই একদিন তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যবানকে। সত্যবান জানতেন ওঁরা বড়লোক, কিন্তু কত বড়লোক, আগে আন্দাজ করতে পারেননি। তাঁর সঙ্গে বাড়ির সবার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন অরুণাভ। ইনি বাবা, ইনি মা, ইনি কাকা, ইনি ঠাকুমা, ইত্যাদি। ভদ্র, মধুর ব্যবহার সবার। বড়মানুষি চাল বা দম্ভ নেই। বনেদিয়ানার আলাদা একটা দ্যুতি থাকে। ওঁদের কথায়বার্তায় আচরণে সেটা ফুটে বেরুচ্ছিল।

সেই প্রথম দিনই বন্দনার সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। তাকে দেখেই চমকে উঠেছিলেন সত্যবান। কত বয়স হবে? পনেরো কি ষোল। গনগনে আগুনের

মতো চেহারা। সত্যবানের মনে হয়েছে, বাইরের চেয়েও ওর ভেতরে অনেক বেশি তীব্র আগুন রয়েছে। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখে বলেছে, 'দাদার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি।'

নিজেদের আত্মীয়পরিজন বাদ দিলে অনাত্মীয় মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস ছিল না সত্যবানের। ভীষণ ভড়কে গিয়েছিলেন। ঘেমে-নেয়ে একাকার। তোতলাতে তোতলাতে কী জবাব দিয়েছিলেন, এত বছর বাদে আর মনে নেই।

তারপর একটানা বন্দনাই বকে গিয়েছিল। সত্যবান শুধু হুঁ হাঁ করে গেছেন। মাঝে মাঝে অরুণাভ বোনকে হালকা ধমক দিয়েছেন। সে শোনেনি।

সেই একদিনই না, আরও অনেকবার সত্যবানকে অরুণাভদের বাড়ি যেতে হয়েছে। তিনি যেতে চাননি। দ্বিধায়, ভয়ে। কারণটা বন্দনা। বাড়ির সবার থেকে মেয়েটা আলাদা। তার তাকানোয়, আচরণে, কথায় বার্তায় কেমন যেন খাই খাই ভাব। নানা ওজর খাড়া করে সত্যবান এড়াতে চাইতেন কিন্তু কে কার কথা শোনে? জোর করে অরুণাভ তাঁকে ওঁদের বাড়ি টেনে নিয়ে যেতেন।

একটু আড়ালে সত্যবানকে পেলেই বন্দনা বলত, 'দাদা বলে আপনি নাকি আসতে চান না?' অনেকখানি ঘন হয়ে এসে গলা নামিয়ে ফিস ফিস করত, 'কেন? আমাকে ভয় পান?'

এত কাছে চলে আসত বন্দনা, তার তপ্ত নিশ্বাস পড়ত বুকে, তার শরীর থেকে উগ্র সুঘ্রাণ উঠে এসে স্নায়ুগুলোকে যেন আচ্ছন্ন করে দিতে থাকত। কী জবাব দেবেন সত্যবান? গলায় স্বর ফুটত না।

একদিন বন্দনা নর্থ ক্যালকাটার একটা নাম-করা স্কুলের নাম করে বলেছিল, 'আমি ওখানে পড়ি। ক্লাস টেন। টিফিনের সময় গেটের সামনে চলে আসবেন।'

লোভ যে হয়নি তা নয়। যাব যাব করে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠেনি সত্যবানের।

পরে যখন বন্দনার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বিদ্রুপে চোখ কুঁচকে গেছে তার। ধিক্কার দিয়ে বলেছে, 'পয়লা নম্বরের ভিতু—'

আরও কয়েকবার স্কুলে যেতে বলেছিল বন্দনা। দু'পা এগিয়ে দশ পা পিছিয়ে এসেছেন সত্যবান। নিজের ভীরুতা তো আছেই। জানাজানি হয়ে গেলে কী ভাববেন অরুণাভ? কী চোখে দেখবেন ওঁদের বাড়ির লোকজন? সমাদর করে যাকে বাড়ির অন্দরমহলে নিয়ে আসা হয়েছে সে-ই কিনা এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল! বদমাশ, দুশ্চরিত্র, ইতর। হয়তো বাবাকেও তাঁর কুকীর্তির কথা জানিয়ে দেবেন। মুখে চুনকালি মেখে বাবার সামনে গিয়ে

দাঁড়াবেন কী করে? দত্তচৌধুরি বংশের সবটুকু সুনাম, সবটুকু মর্যাদা লহমায় ধুলোয় মাটিতে মিশে যাবে।

কিছুদিন অরুণাভদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন সত্যবান। মনে পড়ে, এই সময় কয়েকটা চিঠি লিখেছিল বন্দনা। প্রতিটি চিঠিতেই থাকত তীব্র কশাঘাত—তুমি কাপুরুষ, তুমি অপদার্থ, তুমি ক্লীব। সত্যিই কি সত্যবান তা-ই? অনুভূতিশূন্য কাঠের টুকরো, নাকি হিমশীতল বরফের চাঁই?

তখন তাঁর যুবা বয়স। এক সদ্য যুবতী চোখ-ঝলসানো রূপ নিয়ে তাঁকে অবিরল উসকে চলেছে আর তিনি সাড়া দেবেন না তাই কখনও হয়? কিন্তু অনেক অঙ্ক-টঙ্ক কষে দ্বিধার লক্ষ্মণরেখা পেরুতে না-পেরুতেই আর্মিতে ডাক এসেছিল। পুনেতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অব্দি ফৌজি ট্রেনিংয়ে হাড়মাংস থেঁতো হয়ে যেত। রাতের খাওয়া সেরে যখন শুতেন, সাড় থাকত না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিমেষে লোপ পেয়ে যেত। পরের দিন সকালে উঠে একই ট্রেনিং। মনে হত, সারা শরীর দুরমুশ করা হচ্ছে।

একটানা বছর তিনেক এই রুটিনে চলল। তারপর দু'তিনটে ধাপ পেরিয়ে সত্যবান অফিসার হলেন। এর মধ্যে বন্দনা কি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল? স্মৃতির এই অংশটা আবছা। ঠিক মনে পড়ছে না।

ট্রেনিং পিরিয়ডে বছরে দু'চার দিনের জন্য রাজানগরে তিনি যে আসেননি তা নয়। কিন্তু অরুণাভ তখন কলকাতা ছেড়ে দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চলে গেছেন। তাই ওঁদের বাড়ি যাবার প্রশ্নই নেই। হুট করে হাজির হলে কেন গেছেন, তার কী জবাব দেবেন সত্যবান? 'এই এধারে এসেছিলাম, ভাবলাম একবার খবর নিয়ে যাই, অরুণাভ দিল্লি থেকে ফিরেছে কিনা। আমাকেও খুব তাড়াতাড়ি পুনেতে চলে যেতে হবে, তাই—' এমন একটা অজুহাত খাড়া করার মতো ধূর্ততা বা চতুরালি তাঁর ধাতে নেই। সরল সত্যটাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। বলে ফেলবেন, অরুণাভ নয়, তাঁর যাবার উদ্দেশ্য একটাই—বন্দনা। তখন ওদের বাড়ির লোকজনের কী প্রতিক্রিয়া হবে? কোন দৃষ্টিতে ওঁরা তাঁকে দেখবেন? সত্যবান নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন।

আর্মিতে জয়েন করার পাঁচ বছর বাদে খবর পেলেন একজন ডাক্তারের সঙ্গে বন্দনার বিয়ে হয়েছে। এর কিছুদিন বাদে সত্যবানের জীবনে এলেন চারুলতা। জাগতিক নিয়মেই একে একে এল রাহুল, কাবেরী। অলীক কোনও স্বপ্নের মতো দূর নীহারিকায় বিলীন হয়ে গেল বন্দনা।

তারপর একে একে কত ঘটনা। বাবার মৃত্যু। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় ফৌজ যে অভিযান চালিয়েছিল, তরুণ অফিসার হিসেবে তাতে তাঁর

মরণপণ লড়াই! রাহুল আর কাবেরীর বিদেশে চলে যাওয়া। তার মধ্যে চারুলতার নানা জটিল ব্যাধিতে হঠাৎ শয্যাশায়ী হয়ে পড়া। এই ডাক্তার সেই ডাক্তার, গন্ডা গন্ডা স্পেশালিস্ট দেখিয়েও রোগ আর সারে না। এক বন্ধুর কাছে খবর পেয়ে সত্যবান ছুটলেন আলিপুরে ডাক্তার জ্যোতির্ময় বাসুর চেম্বারে। নিজের বাড়িতেই তাঁর চেম্বার। তাছাড়া কলকাতার বড় বড় তিন চারটে নার্সিং হোমের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। বছরে তিন মাস ইউরোপ, আমেরিকায় কাটান। মেডিক্যাল কনফারেন্সে, সেমিনারে পেপার পড়েন, কিংবা দামি দামি ভাষণ দেন।

ডাক্তার হিসেবে ডাক্তার বাসুর প্রচুর নামডাক, বিপুল পসার। তাঁর নামের পাশে দেশ-বিদেশের অগুনতি ডিগ্রির লম্বা লাইন। তিনিও কিন্তু চারুলতাকে সুস্থ করে তুলতে পারলেন না। সাময়িক কিছু রিলিফ দিতে পেরেছিলেন। মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব হয়নি।

আলিপুরে ছোটাছুটি করতে করতে একদিন অপার বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন সত্যবান। ওখানে দেখা হয়েছিল বন্দনার সঙ্গে। জানা গেল, বন্দনা ডাক্তার বাসুর স্ত্রী। বহুকাল বাদে বিস্মৃতির পুরু স্তর ভেদ করে বেরিয়ে এল হারিয়ে-যাওয়া অতীত। জীবন পরমাশ্চর্য এক ম্যাজিক। তার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকে কত যে নাটক, কত যে চমক! হঠাৎ হঠাৎ সেগুলো বেরিয়ে আসে।

নতুন করে আবার যোগাযোগ ঘটল বন্দনার সঙ্গে। চারুলতার শ্রাদ্ধের দিন ডাক্তার বাসুর সঙ্গে তিনিও সত্যবানদের রাজানগরের বাড়িতে এসেছিলেন।

সময় কেটে যাচ্ছিল তার নিজস্ব নিয়মে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, তারপর ফের সূর্যোদয়। নিরবধিকাল আহ্নিক গতিতে লহমার জন্যও ছেদ পড়ে না। এই ভাবেই চলে যায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, পুরনো বছর পেছনে ফেলে আসে নতুন নতুন বছর।

চোখের পলকে ক'টা বছর পার হয়ে গেল। তার মধ্যে আচমকা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন ডাক্তার বাসু। ওঁদের একমাত্র ছেলে ববি চলে গেছে লন্ডনে। আলিপুরের বাড়িতে বন্দনা একেবারে একা।

এরপর ঘটল কার্গিল যুদ্ধ। বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে অবসর নিয়ে রাজানগরে ফিরে এলেন সত্যবান। সময়ের চাকায় পাক খেতে খেতে ফের বন্দনা কাছাকাছি এসে পড়েছেন। নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব বন্দনা রোজ ব্রেকফাস্টের সময় একবার ফোন তো করেনই, মাঝে মাঝে রাতের দিকেও করেন। একবার কথা শুরু হলে পনেরো-কুড়ি মিনিটের আগে ছাড়তে চান না...

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। আচমকা বন্দনার ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বর কানে জোরালো ধাক্কা দেয়—'কী হল, চুপ করে আছ যে?'

প্রবল ঝাঁকুনিতে আনমনা ভাবটা কেটে যায় সত্যবানের। অদৃশ্য টাইম মেশিন তাঁকে দূর অতীতে নিয়ে গিয়েছিল। লহমায় সেটা আজকের এই সকালবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বিব্রতভাবে বলেন, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে?'

'ও-ও, এতক্ষণ আমি বকে গেলাম। ভাল করে তাহলে কিছুই শোননি?' বন্দনার গলা কয়েক পর্দা উঁচুতে ওঠে। তাতে মেশানো রয়েছে ক্ষোভ, অভিমান, বিরক্তি।

'শুনেছি, শুনেছি—'

বন্দনা বললেন, 'তোমাকে আগেও বলেছি, আজও স্পষ্ট করে বলছি, আমার পক্ষে একা একা এই বাড়িতে থাকা একেবারেই সম্ভব না। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

একটু ফিচলেমি করতে ইচ্ছে হল সত্যবানের। সৎ পরামর্শদাতার মতো বললেন, 'একটা কাজ করতে পার—'

'কী?'

'মাঝে মাঝে বাগবাজারে বাপের বাড়ি গিয়ে ক'টা দিন কাটিয়ে এলে ভাল লাগবে। নইলে দাদার ছেলেমেয়েদের কারওকে নিজের কাছে এনে রাখো। মনোটোনি, লোনলিনেস—সব কেটে যাবে।'

'আমি—আমি—'

ঝংকার দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলেন বন্দনা। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সত্যবান বলতে থাকেন, 'কম বয়সের ছেলেমেয়েরা কাছে থাকলে নিজেকে ফ্রেশ মনে হবে। দেখবে সারাক্ষণ নতুন এনার্জিতে টগবগ করে ফুটছ।'

জোরে ধমক দিলেন বন্দনা। —'চুপ কর। তামাশা ভাল লাগছে না।'

ভালমানুষের মতো গলা করে সত্যবান বললেন, 'এটাকে তুমি তামাশা বলছ! যে কোনও ওয়াইজ, এল্ডার্লি পারসনকে জিজ্ঞেস কর, তাঁরা বলবেন ইয়াং বয় বা গার্লদের কোম্পানি টনিকের কাজ করে।'

বন্দনা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। —'কারওকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি জানতে চাই, তুমি কবে আসবে?'

'এই তো রোজ একবার দু'বার করে কথা হচ্ছে। আমার যাবার জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠেছ কেন?'

'সেটা বুঝেও না-বোঝার ভান করছ!'

সত্যবান উত্তব দেন না।

বন্দনা বললেন, 'তুমি যদি না আসো, আমাকেই একদিন তোমাদের বাড়িতে যেতে হবে।' তাঁর গলায় এবার বিরক্তি, ঝাঁঝ বা অসন্তোষ নেই। বরং অদ্ভুত এক দৃঢ়তা রয়েছে।

এতকাল সত্যবানকে তাঁদের আলিপুরের বাড়িতেই যেতে বলেছেন বন্দনা। একরকম জোরই করেছেন। কিন্তু কখনও জানাননি, রাজানগরে আসবেন। সত্যবান হকচকিয়ে যান। বন্দনা কী ধরনের মেয়ে, সেই যুবা বয়সেই টের পেয়েছিলেন। জেদি, বেপরোয়া, দুঃসাহসী। আর্মিতে জয়েন করার পর যোগাযোগটা ছিঁড়ে যায়। তিনি কলকাতায় থাকলে খুব সহজে যে রেহাই পাওয়া যেত না, সেটা তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে।

সেই কম বয়সে মাথার ওপর বন্দনার বাবা মা ঠাকুরদারা ছিলেন। রাস টেনে ধরার মতো সেই সব অভিভাবকদের অনেকেই মারা গেছেন। যাঁরা আছেন, নিজেদের নানা সমস্যায় ঝালাপালা। সত্যবান শুনেছেন, বন্দনাদের সেই জয়েন্ট ফ্যামিলি আর নেই, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অরুণাভ আছেন মুম্বাইতে। তিনি ভীষণ অসুস্থ। খুড়তুতো জেঠতুতো ভাইরা বাগবাজারের বাড়ি ছেড়ে, ফ্ল্যাট কিনে, শহরের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নিজেদের ঝামেলা ঝঞ্ঝাট সামলে কে আর বন্দনার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে যাবে? কার হাতে এত অঢেল সময়! সময় থাকলেও অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবার ইচ্ছে বা উদ্যম কোনওটাই কি আছে? মানুষের মনোভাবটাই পালটে গেছে। নিজেকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত। নিজের নিজের কক্ষপথেই পাক খাচ্ছে। মানুষ এখন বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক।

স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। ছেলে বিদেশি সিটিজেনশিপ নিয়ে লন্ডনে থাকে। কলকাতায় তার ফেরার আদৌ কোনও সম্ভাবনা নেই। বন্দনার সঙ্গে তার যেটুকু সম্পর্ক, সবই টেলিফোনে। তাও রোজ রোজ নয়, ক্বচিৎ কখনও। বন্দনার জীবন এখন পুরোপুরি বল্গাহীন। লোকলজ্জা বলতে তাঁর কিছুই নেই। কে কী ভাবল, কে কী বলল, গ্রাহ্যই করেন না। তুড়ি মেরে সে-সব উড়িয়ে দেন।

বন্দনা যে ধরনের মহিলা, তাঁর পক্ষে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। হয়তো এ বাড়িতে এসে এমন কাণ্ডমাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন যে মাথা হেঁট হয়ে যাবে সত্যবানের। রাজানগরে তাঁর উজ্জ্বল একটা ইমেজ রয়েছে। এলাকার মানুষ তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। বন্দনার জন্য কারও দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারবেন না। তিনি আসার আগেই রুখে দেওয়া দরকার। উৎকণ্ঠিত সত্যবান

ব্যস্তভাবে বলে ওঠেন, 'শিগ্‌গির আমি একদিন তোমাদের আলিপুরের—' বলতে বলতে থমকে যেতে হল। বন্দনা লাইন কেটে দিয়েছেন।

এখনই ফোনে বন্দনাকে ধরা যায়। কী ভেবে ফোনটা আর করলেন না সত্যবান। পরে একসময় বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওঁকে শান্ত করবেন।

আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। টোস্ট ওমলেট টোমলেট একধারে সরিয়ে টি-পট থেকে কাপে লিকার ঢেলে তার সঙ্গে দুধ-চিনি মিশিয়ে দূরমনস্কর মতো চুমুক দিতে লাগলেন সত্যবান। আর তখনই তাঁর চোখ চলে গেল বুক-কেসের মাথায় চারুলতার ফোটাটার দিকে। সেই নিষ্পাপ মুখ। স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত। চিরকালের মতো ধরা পড়ে গেছে ক্যামেরায়। যতদিন সত্যবান বেঁচে আছেন, ফোটোর ওই মানুষটি তাঁর দিকে তাকিয়ে অমলিন হাসি বিকিরণ করে যাবেন।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সত্যবান। পলকহীন। তারপর হঠাৎই একটু মজা করতে ইচ্ছা হল। চোখ সরু করে ভুরু নাচাতে নাচাতে বললেন, 'কিরকম বুঝলে? তোমার অসুখের সময় কয়েকবার বন্দনাদের আলিপুরের বাড়িতে তোমাকে নিয়ে গেছি। মহিলা খুব সুন্দরী, না? আ স্টানিং বিউটি। ফোটোর ভেতরে থেকে রোজই তো দেখতে পাও, এই ব্রেকফাস্টের সময় ও ফোন করে। বন্দনা আমাকে গিলতে চায়।'

ফোটোর হাস্যোজ্জ্বল মহিলাটি নীরব।

সত্যবান একই সুরে বলতে থাকেন, 'আমি কিন্তু টসকাইনি। তুমি চলে যাবার পর ব্রহ্মচারী হয়ে আছি। আমার মুণ্ডু চিবনো বন্দনার কম্মো নয়। নিশ্চিন্ত থাকো।' একটু থেমে ফের বলেন, 'এই ঘরে সারাক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে পাহারা দিচ্ছ। বেয়াড়া কিছু করি তেমন সাহস কি আমার আছে? শ্রীমতী চারুলতা দত্তচৌধুরি যেখানে নজরদার সেখানে পদস্খলন অসম্ভব।'

সাত

দৈনন্দিন রুটিনের পর পর তিনটে কাজ হয়ে গেছে। প্রাতর্ভ্রমণ, ব্রেকফাস্ট এবং ফোনে নানা কৌশলে বন্দনাকে ঠেকিয়ে রাখা। সপ্তাহের তিনটে দিন বাজারের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। আজ ছিল তেমনই একটা দিন। সেটাও সারা হয়েছে।

রোজকার কর্মসূচি অনুযায়ী এবার স্নানের পালা। ইজি চেয়ার থেকে হাতের ভর দিয়ে উঠে সোজা বাথরুমে ঢুকে গেলেন। গিজার চালিয়ে খানিকটা জল গরম করে ঠান্ডা জলে মিশিয়ে নিলেন।

স্নান সারা হলে চুলটুল আঁচড়ে পোশাক বদলানো হল। এবার আর ফৌজি উর্দি নয়, ধবধবে পাজামা এবং পাঞ্জাবি। বেলা অনেকটাই চড়েছে। ভোরের দিকের সেই ঠান্ডা, গা শিরশির-করা ভাবটা নেই। দিনের তাপাঙ্ক বেড়ে গেছে। পাতলা চাদর বা হাত-কাটা সোয়েটার দরকার হবে না।

সত্যবান একতলায় নেমে এলেন। এই সময়টা তিনি 'সুরক্ষা'য় গিয়ে একটানা সাড়ে বারোটা অব্দি নানা ধরনের কাজে ডুবে থাকবেন। জলাভূমি সংরক্ষণ, পরিবেশ বাঁচাও, ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি লেখা, অফিসারদের ফোন করা—কাজের কি শেষ আছে? 'সুরক্ষা'য় যাঁরা তাঁর সহকর্মী বা সহযোদ্ধা, এ-বেলা তাদের কারওকে পাওয়া যায় না। তাদের কেউ কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, অনেকেই চাকরি বাকরি করে। তারা আসবে সন্ধের পর। পড়ুয়া ছেলেরা তখন বেশিক্ষণ থাকে না, সত্যবানই থাকতে দেন না। তাদের পড়াশোনা আছে। আসল কাজকর্ম সামলানোর পর তবে তো জলাভূমি, তবে তো পরিবেশ রক্ষা। ভাল রেজাল্ট না করে উপায় আছে? আজকাল কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় উতরে যেতে না পারলে চাকরি বাকরি মিলবে? অল্পবয়সীরা তেমন না থাকলেও সন্ধের দিকে বয়স্করা ভিড় জমান।

এ-বেলাও দু'চারজন রিটায়ার্ড লোকজন আসেন। বেশির ভাগেরই সত্যবানের কাছাকাছি বয়স। কেউ সামান্য বড়, কেউ বা দু-এক বছরের ছোট। তিনি এঁদের মাথায় পরিবেশ-টরিবেশের বাতিকটা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন।

একতলার এক মাথায় কিচেন। আরেক মাথায় নাটুদের ঘরের বাঁ দিক ঘেঁষে আরও একটা ঘর রয়েছে। সেটাই 'সুরক্ষা'র অফিস। দরজার মাথায় কাঠের ফলকে অফিসের নাম লেখা।

চওড়া বারান্দা থেকে বাগানের ভেতর দিয়ে নুড়ির রাস্তায় আওয়াজ তুলে যেতে যেতে বাঁ দিকে তাকালেন সত্যবান। কারওকেই দেখা গেল না। তবে কিচেন থেকে ছ্যাঁক-ছোঁক আওয়াজ আসছে। তার মানে পুরোদমে লক্ষ্মীর রান্নাবান্না চলছে।

সত্যবান ডাকলেন, 'কই রে চ্যালারাম, নুলবুলি, বগুনি, কোথায় গেলি তোরা?'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল লক্ষ্মী। হাতে খুন্তি। গ্যাসের উনুনের তাতে কপালে দানা দানা ঘাম জমেছে তার। আঁচলে হলুদের দাগ। সে বলল, 'বাবা, নাটু চান করতি গ্যাচে। তার ইস্কুলির সোময় হয়ে এসিচে। আর—'

তার কথা শেষ হবার আগেই শিবু আর ফতু ওপাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। শিবুর বগলে ক্রাচ। বাজার-টাজার করে আসার সময় ফতু যেভাবে বুকের কাছে মুঠো পাকিয়ে উত্তেজনায় খুশিতে কাঁপছিল, আর গলার ভেতর থেকে জড়ানো ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করছিল, এখনও তাই করতে লাগল। শিবু ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে আসছিল। সত্যবানকে দেখলে সেও কী খুশি যে হয়!

সত্যবান হাত তুলে বললেন, 'এখন না, এখন না। খাবার সময়—' দুপুরে শিবু আর ফতুকে নিয়ে একতলার ডাইনিং রুমে খেতে বসেন তিনি। রবিবার এবং অন্য যে-সব দিন নাটুর স্কুলে ছুটি থাকে, সেও একসঙ্গে খায়।

বাগান পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরে ক'পা গেলেই 'সুরক্ষা'র অফিস। সেটা বন্ধ রয়েছে। সত্যবান চাবি নিয়ে এসেছিলেন, তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

একটা ড্রয়ারওলা মস্ত টেবল, খান কয়েক চেয়ার, বইয়ের র‍্যাক, টেলিফোন, দু'তিনটে আলমারি, ছ'সাতটা বেতের মোড়া—এই হল 'সুরক্ষা'র অফিস।

সত্যবানকে দেখে বগুলা সিং দৌড়ে এসেছিল। সে দ্রুত জানালাগুলো খুলে, ঝাড়ু দিয়ে ঘর সাফ করে দিল। ছুটির দিনে নাটু এগুলো করে দেয়।

কাজ শেষ করে বগুলা সিং গেটের দিকে চলে যায়। টেবলের এক দিকে পুরু গদিওলা চেয়ার। সত্যবান সেটায় বসেন। টেবলের আরেক দিকে সারি দিয়ে যে-সব চেয়ার রয়েছে সেগুলো 'সুরক্ষা'র অন্য মেম্বারদের জন্য। ভিজিটররা এলে তারাও ওখানে বসে।

টেবলের ওপর রাইটিং প্যাড, কলম, পেপার কাটার, পিন কুশন ইত্যাদি ছাড়াও রয়েছে বেশ ক'টা ফাইল।

নিজের চেয়ারে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন সত্যবান। খানিক আগে বন্দনা কী যে টেনশনের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন! উৎকণ্ঠায় দমবন্ধ হয়ে

আসছিল তাঁর। ধীরে ধীরে চাপটা কেটে যাচ্ছে। উৎকণ্ঠা থেকে আপাতত মুক্তি। কাল এই সময় আবার বন্দনার ফোন আসবে। ফের কোনও কৌশলে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু কালকের কথা কাল।

ডাঁই-করা ফাইল থেকে একটা বার করে নিলেন সত্যবান। যিশু আর তপুকে সারা রাজানগর ঘুরে ঘুরে ছোট-বড় নানা ওয়েটল্যান্ডের একটা তালিকা তৈরি করতে বলেছিলেন। কোথায়, কোন কোন এলাকায় সেগুলো রয়েছে, কোনটার মাপ কতখানি, মালিক কারা, তার সবিস্তার বিবরণও চেয়েছেন।

যিশু এবং তপু দু'জনেই এম. এসসি করছে, একজন অ্যাপ্লাইড ফিজিকসে, আরেকজন কেমিস্ট্রিতে। ফাইনাল পরীক্ষার বেশি দেরি নেই। পড়ার প্রচণ্ড চাপ। তাই সব ওয়েটল্যান্ডের ইনফরমেশন জোগাড় করতে পারেনি, অনেক বাকি অছে। যেগুলোর পেরেছে, ওই ফাইলে তা রয়েছে। যিশুরা জানিয়েছে, পরীক্ষার পর বাকি কাজ শেষ করে ফেলবে।

ফাইল খুলে রিপোর্টগুলো বার করলেন সত্যবান। শুধু রাজানগরেরই নয়, চারপাশের পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে যাবতীয় জলাজমি সম্পর্কে সমস্ত তথ্য রেকর্ড করা হবে। সেই সঙ্গে সেগুলোর ছবি তুলে, ম্যাপও করিয়ে রাখবেন সত্যবানেরা। অনেক সময় লাগবে ঠিকই, কিন্তু কাজটা ভীষণ জরুরি।

যিশুদের দেওয়া রিপোর্টগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন সত্যবান। এতক্ষণ নানা মানুষ, নানা ঘটনার জটলায় সনেকপুরের সেই তিন-চার বিঘের বড় দীঘিটার কথা খেয়াল ছিল না। ফের তা মনে পড়ে গেল। তার সঙ্গে হুড়মুড় করে চোখের সামনে ভিড় করে এসে দাঁড়াল সেখানকার বাসিন্দা হাফেজ আলি, গোবিন্দ মণ্ডল, জন নিরাপদ বিশ্বাস, শিবু নস্কররা। তাদের সঙ্গে যার চিন্তাটা মাথায় ঢুকে গেল সে গাল-কাটা গাব্বা। এই বেপরোয়া বন্দুকবাজ এবং তার দলবল ওখানকার জলাটা বুজিয়ে ফেলছে। এমন বিদঘুটে নাম কারও হতে পারে, ধারণাই ছিল না সত্যবানের। সে যাই হোক, হাফেজ আলিরা জানিয়েছে, ওই গাল-কাটা গাব্বা নামের ক্রিমিনালটির পেছনে রয়েছে কোনও একটা পলিটিক্যাল পার্টি আর সেই পার্টির খুঁটির জোরে জলাভূমি বোজানোর মতো চূড়ান্ত বেআইনি কাজ করছে সে।

সমস্ত জেনেশুনে এবং স্বচক্ষে দেখার পর সত্যবান এবং 'সুরক্ষা'র মেম্বাররা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না, কোনওভাবেই নয়। এই জঘন্য দুষ্কর্ম বন্ধ করতেই হবে। তার আগে জানতে হবে কোন পার্টির ছাতাব তলায় গাল-কাটা গাব্বারা শেলটার নিয়েছে। কিন্তু সেটা জানা যাবে কিভাবে?

হঠাৎ টেলিফোনের আওয়াজে ভাবনাটা ছত্রখান হয়ে গেল সত্যবানের। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে চেনা গলা ভেসে এল, 'নমস্কার মেজর সাহেব—'

না, লোকটাকে তিনি কখনও দেখেননি। কিন্তু পরশু রাতে সে ফোন করেছিল। এই বয়সেও সত্যবানের স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর। একটা ইন্দ্রিয়ও অকেজো হয়ে যায়নি, সব ক'টাই যুবা বয়সের মতো প্রখর। একবার যা শোনেন, কখনও ভুলে যান না, স্মৃতিতে তা ধরা থাকে। কণ্ঠস্বরটা তিনি ঠিক মনে করে রেখেছেন।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে লোকটা কী বলতে চায় শোনার জন্য প্রবল আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন সত্যবান।

লোকটা বলল, 'পরশু ফোন করে আপনাকে একটা খবর দিয়েছিলাম।'

'মনে আছে।'

'লক্ষ করেছি আজ ভোরে আপনি বিরাট ব্রিগেড নিয়ে সনেকপুরের দিকে গেলেন।'

দারুণ একটা চমক লাগল সত্যবানের। লোকটা শুধু ফোনেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না, তাঁর গতিবিধির ওপরও নজর রাখছে। তার মানে সে রাজানগরেরই বাসিন্দা। তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি কোথাও থাকে। নইলে অত ভোরে সনেকপুরে তাঁদের যাওয়ার ব্যাপারটা জানল কী করে?

ভেতরে বেশ নাড়া লেগেছিল। কিন্তু সেটা বুঝতে দিলেন না সত্যবান। খুব শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। যাই কিনা সে জন্যে পরশু থেকে আমার মুভমেন্ট মনিটর করে যাচ্ছিলেন বোধহয়?'

লোকটা হয়তো সামান্য থতিয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা বলতে পারেন। ইন ফ্যাক্ট, পরশু থেকেই না, অনেকদিন ধরেই আপনার নানা ধরনের অ্যাক্টিভিটি ওয়াচ করে যাচ্ছি।'

সত্যবান চকিত হয়ে ওঠেন।—'হোয়াই? এর কারণটা কী?'

'সে-সব পরে কখনও সুযোগ হলে আলোচনা করা যাবে। এখন এটুকুই শুধু বলে রাখি আমাদের সোসাইটির জন্যে আপনি আর আপনার 'সুরক্ষা' খুব ইমপর্টান্ট সব কাজ করে যাচ্ছে।'

রহস্যময় লোকটা সত্যবানকে ধন্দে ফেলে দেয়। তিনি বললেন, 'আলোচনা যে করব, আপনার নামই তো জানি না।'

লোকটা উত্তর দেয় না।

সত্যবান জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি খুব সম্ভব রাজানগরেই থাকেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। এর বেশি আপাতত আমার সম্বন্ধে আর কোনও কৌতূহল দেখাবেন না। ঠিক সময় আপনার সঙ্গে দেখা করব। তখন আমার নামধাম সমস্ত জানতে পারবেন।'

সত্যবান বললেন, 'ঠিক আছে—'

'এখন এটুকুই জেনে রাখুন, আপনাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে।'

'ধন্যবাদ।'

'এবার আসল কথায় আসা থাক। সনেকপুরের যে জলাটার খবর দিয়েছিলাম সেটা ঠিক তো?'

'হ্যাঁ, হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক। নিজের চোখেই দেখে এলাম। কিন্তু জলাটা ওরা বোজাতে চাইছে কেন?'

লোকটা বলল, 'কেন আবার, ওটা বোজালে যে জমি বেরুবে সেটা প্রোমোটারকে বেচে দেবে। প্রপার্টির মালিকের কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তারা ওখানে আসেই না। এতে ক্রিমিনালগুলোর সুবিধেই হয়েছে।'

সত্যবান অবাক।—'অতদূরে প্রোমোটাররা জমি কিনতে যাবে কেন?'

সত্যবানের অজ্ঞতায় বা অদূরদর্শিতায় মজাই পায় লোকটা। বলে, 'মেজরসাহেব, আপনি জ্ঞানী মানুষ। পৃথিবীর অনেক কিছু জানেন। আবার অনেক কিছুই আপনার অজানা থেকে গেছে।'

'কিরকম?'

'কলকাতাকে ঘিরে নতুন নতুন অনেক টাউনশিপ তৈরি হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। আট-দশ বছর বাদে সনেকপুর কি আর ওইরকম শ্যাবি আধা-গ্রাম আধা-শহর হয়ে থাকবে। ওটা ঝকঝকে একটা টাউন হয়ে উঠবে। বলতে পারেন কলকাতা মেট্রোপলিসেরই এক্সটেনসন। সেই ফিউচারের দিকে তাকিয়ে এখনই জমিজমার ব্যবস্থা করে রাখছে প্রোমোটাররা।'

'বলেন কী!'

'ঠিকই বলছি মেজরসাহেব। রাজানগরের চারপাশে অনেক ওয়েটল্যান্ডের ওপর প্রোমোটারদের নজর এসে পড়েছে। কোন কোন জলা, দীঘি বা পুকুরটুকুর ওরা বোজাবার মতবল আঁটছে, খবর পেলেই আপনাকে জানিয়ে দেব। আশা করি, আপনাদের অর্গানাইজেশন বেআইনি কাজ রুখে দেবে।'

একটু চুপ করে থাকার পর সত্যবান বললেন, 'একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না মিস্টার—'

লোকটা বলল, 'মিস্টারের পরের অংশ, মানে আমার পদবিটা, আপাতত জানাচ্ছি না। এখনও আমার পরিচয়টা গোপনই থাক। বলুন কী ভেবে পাচ্ছেন না?'

'আমাদের স্টেটে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে, মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সেখানে এই বেআইনি ব্যাপারটার কথা জানাচ্ছেন না কেন?'

সে-সব জায়গায় জানালে যদি কাজ হত, আপনাকে কি বিরক্ত করি?'

আচমকা সেই নামটা মনে পড়ে গেল সত্যবানের। জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, গাল-কাটা গাব্বা বলে একটা অ্যান্টি-সোশাল সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেন?'

লোকটা বলল, 'পারি। ওর কেরিয়ারের শুভারম্ভটা হয়েছিল ছোটখাটো ছিনতাই দিয়ে। বছরখানেকের ভেতর হয়ে ওঠে মার্কামারা মাস্তান। তারপর শুধু আকাশের দিকে উত্থান। মেটিওরিক রাইজ। মাস্তান থেকে সে হল ওয়াগন ব্রেকার। রাজানগরের রেলওয়ে ইয়ার্ডে যে গুডস ট্রেনগুলো এসে থামে, রাতের অন্ধকারে তার ওয়াগন ভেঙে দামি দামি মাল সরাতে লাগল। ওয়াগন ব্রেকার থেকে সে হল গানম্যান, মারাত্মক বন্দুকবাজ। হি ইজ আ ক্র্যাক-শট। ট্রিগার টিপলে তার বুলেট টার্গেটে হিট করবেই।'

গাল-কাটা গাব্বার জীবনেতিহাসটি চমকে দেবার মতো। সত্যবান বললেন, 'আই সি—'

'মেজরসাহেব, হি ইজ আ ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। দরকারমতো অনেকেই তাকে কাজে লাগায়।'

'আমি শুনেছি সে একটা পলিটিক্যাল পার্টির শেলটারে আছে।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'কোন পার্টি?'

'সেটা আপাতত জানাতে পারছি না। আপনাকেই তা খুঁজে বার করতে হবে।'

'জানাতে পারছেন না কেন?'

'অসুবিধে আছে।'

একটু চুপচাপ।

হঠাৎ সত্যবানের মনে হল, এই অচেনা লোকটার কি কোনও অভিসন্ধি রয়েছে? সে কি ধুরন্ধর? পরিবেশ এবং জলাভূমি রক্ষার নাম করে তাঁকে গাল-কাটা গাব্বা আর তার গডফাদার কোনও রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে

লেলিয়ে দিতে চাইছে? কিংবা সে কি ভীরু? গাল-কাটা গাব্বাদের অপকর্ম ঠেকাবার মতো সাহস তার নেই?

সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী লাইনে আছেন?'

সাড়াশব্দ নেই। ও প্রান্তের লোকটা ফোন নামিয়ে রেখেছে।

রোজ 'সুরক্ষা'য় দুপুর অবধি কাটিয়ে অফিসে তালা লাগিয়ে একতলায় খাওয়ার ঘরে চলে আসেন সত্যবান। আজও এলেন। অন্য দিন শিবু আর ফতুর সঙ্গে মজা করতে করতে খান। আজ নাটুর স্কুল আছে। তাই খাবার টেবলে তাকে পাওয়া গেল না।

সত্যবান খাচ্ছেন ঠিকই, ফতুদের সঙ্গে একটু-আধটু রগড়ও করছেন, কিন্তু কেমন যেন আনমনা। আজকের দিনটা তাঁর জীবনে বেশ ঘটনাবহুল। পরশু একটা উড়ো ফোন পেয়ে দলবল নিয়ে সনেকপুর ছোটা, স্বচক্ষে জলা বোজানোর দুরভিসন্ধি দেখে আসা, হাজারি বুড়ির নাতনি চম্পার বিয়ের জন্য কলকাতা থেকে অল্পদিনের চেনা মমতা নামে কোনও এক মেয়েমানুষের যেচে সম্বন্ধ নিয়ে আসা, বন্দনার এ-বাড়িতে আসার হুমকি, রজত আর রিনির লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম, ফের পরশু রাতের সেই অচেনা রহস্যময় লোকটার ফোন—সব মিলিয়ে মাথায় বনবন করে চরকি ঘুরে যাচ্ছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে দোতলায় নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন সত্যবান। আর্মিতে যখন ছিলেন, দিবানিদ্রার কথা ভাবতেও পারতেন না। কিন্তু অবসর নেবার পর দুপুরে ঘণ্টাখানেক না শুলে বিকেলের দিকে মাথা টিপটিপ করে। টের পান, সতেজ যৌবন বহুদিন আগেই পেরিয়ে এসেছেন। শরীরের টিস্যুগুলোতে চোরা হানাদারের মতো ঢুকে গেছে ক্ষয়। বয়সকে ঠেকানো মুশকিল।

কাল রাতে অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ড নিয়ে একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। সেই বইটা খাটের একধারে পড়ে ছিল। সেটা তুলে পাতা ওলটাতে ওলটাতে দু'চোখ ঘুমে জুড়ে এল।

আট

ছুটিছাটা ছাড়া দিনের বেলা অন্য কারও সময় হয় না। কচিৎ দু-একজন রিটায়ার্ড বয়স্ক মেম্বার আসেন। তাও ন'মাসে ছ'মাসে হঠাৎ কোনও একদিন। 'সুরক্ষা'র দায়িত্ব তখন একাই সামলাতে হয় সত্যবানকে। কিন্তু সন্ধের পর অনেকেই হাজির হয়। আজও হয়েছে। ভোরে যারা প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিল, তারা ছাড়াও বেশ কয়েকজন সিনিয়র মেম্বার, যেমন পরমেশ ধর, নিশানাথ ভট্টাচার্য, অবনীমোহন চ্যাটার্জি, দেবজ্যোতি তরফদার, আনন্দগোপাল লাহিড়ি আর মণিময় হালদারও এসেছেন। পরিবেশরক্ষার ব্যাপারে এঁদের উৎসাহ সত্যবানের চেয়ে লেশমাত্র কম নয়। কিন্তু বয়সের কারণে এবং নানা রোগে শরীর নড়বড়ে হয়ে যাওয়ায় দিনের বেলাটা বাড়ি থেকে বেশি বেরোন টেরোন না। সন্ধের পর সুস্থ বোধ করলে 'সুরক্ষা'য় চলে আসেন।

সনেকপুরের জলাভূমি বোজানো এবং গাল-কাটা গাব্বা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গকে নিয়ে আজ তুমুল আলোড়ন চলছে। 'সুরক্ষা'র মেম্বারদের চোখেমুখে প্রবল উত্তেজনা। সবাই শোরগোল বাধিয়ে দিয়েছে। কোনওভাবেই এই অপরাধ বরদাস্ত করা হবে না।

নিশানাথ বললেন, 'যেমন করে হোক, জলাভূমিটা বাঁচাতেই হবে।'

পরমেশ ধর ধীর, স্থির, বিবেচক। ঝোঁকের বশে বা উত্তেজনার মাথায় কোনও কাজ করেন না। যা করার, আটঘাট বেঁধে, সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে, তবেই করে থাকেন। বললেন, 'ওটা বাঁচাতে গেলে গাল-কাটা গাব্বাদের দুষ্কর্ম বন্ধ করা দরকার।'

সবাই সমস্বরে হইচই জুড়ে দেয়, 'তা তো করতেই হবে।'

'কিন্তু একটা দিক ভেবে দেখেছ?'

'কী?'

'ও একটা পলিটিক্যাল পার্টির লেজুড়। ওর গায়ে হাত পড়লে পার্টি রে রে করে ওকে প্রোটেকশন দিতে বেরিয়ে পড়বে।'

সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'পার্টির ব্যাকিং আছে বলে এইরকম একটা ক্রাইম করে পার পেয়ে যাবে, আর আমরা মুখ বুজে বসে থাকব? স্ট্রেঞ্জ!'

পরমেশ বললেন, 'নট অ্যাট অল। আমি সে কথা বলিনি।'

সত্যবান প্রাক্তন ফৌজি অফিসার। তিনি ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না। তাঁর ভাবনাচিন্তা রাইফেলের গুলির মতো সোজাসুজি ধেয়ে যায়। উত্তেজনার সুরে বললেন, 'যদি কনফ্রনটেশন করতে হয়, করা হবে।'

পরমেশ হাসলেন। 'একেবারে মেজরসাহেবের মতো বললেন সত্যবানদা—' তিনি বয়সে সত্যবানের চেয়ে ছোট। তাই দাদা। বলতে লাগলেন, 'আল্টিমেটলি হয়তো সংঘাতে যেতে হবে। কিন্তু তার আগে অন্যরকম একটা স্ট্র্যাটেজির কথা ভাবলে হয় না?'

স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ রণকৌশল। সত্যবানের কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কি সেরকম কিছু ভাবছিস নাকি?'

'হ্যাঁ—' আস্তে মাথা নাড়েন পরমেশ।

সত্যবান উৎসুক হন। —'সেটা কী?'

'আমাদের আসল উদ্দেশ্য হল সনেকপুরের জলাভূমিটা বাঁচানো, তাই তো?'

'হ্যাঁ, তা-ই।'

'সনেকপুর রাজানগর মিউনিসিপ্যালিটির আওতায় পড়ে। আপাতত গাল-কাটা গব্বা নামে মহাপুরুষটির পেছনে এনার্জি নষ্ট না করে শ্যামাদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করা যাক।'

রাজানগরে তিন-চার জন শ্যামাদাস চক্রবর্তী আছে। সত্যবান বললেন, 'কোন শ্যামাদাসের কথা বলছিস? মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্যামাদাসবাবু?'

'এগ্‌জাক্টলি। ওয়েটল্যান্ড রক্ষা করা ওঁদের ডিউটির মধ্যে পড়ে। শ্যামাদাসবাবুকে খবরটা দিয়ে দেখা যাক ওঁরা কী করেন। যতদূর জানি উনি আপরাইট লোক। আশা করি, এই অন্যায় সহ্য করবেন না।'

প্রায় সকলেই পরমেশের কথায় সায় দিল। শুরুতেই অ্যান্টি-সোশাল এলিমেন্টের সঙ্গে লড়াইতে না গিয়ে মিউনিসিপ্যালিটিকে দিয়ে জলাভূমি ভরাট করাটা রুখে দেওয়া অনেক শ্রেয়। তাতে অনর্থক শক্তিক্ষয় হবে না। কাজটাও স্মুদলি হয়ে যাবে।

সত্যবানকেও স্বীকার করতে হল, পরমেশ সঠিক পরামর্শই দিয়েছেন।

নিশানাথ ভট্টাচার্য কথা কম বলেন। এমন নীরব, ধৈর্যশীল শ্রোতা ক্বচিৎ চোখে পড়ে। এতক্ষণ চুপচাপ সবার কথা শুনে যাচ্ছিলেন। এই প্রথম মুখ খুললেন, 'মিউনিসিপ্যালিটিতে যে কারণে যাওয়া হচ্ছে, সেটা তো আছেই। সেই সঙ্গে আরও একটা কাজ করতে হবে।'

সকলের চোখ নিশানাথের দিকে ঘুরে যায়। সত্যবান জিজ্ঞেস করেন, 'কী কাজ?'

'শ্যামাদাসবাবু রাজনীতির লোক। ওঁদের পার্টির টিকেটে জিতে মিউনিসিপ্যালিটিতে এসেছেন। উনি হয়তো জানতে চাইবেন, কোন পার্টির ছাতার তলায় গাল-কাটা গাব্বা মাথা ঢুকিয়েছে।'

জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেলেন সত্যবান। কয়েক লহমা চুপ করে থেকে বললেন, 'মিউনিসিপ্যালিটি যখন জলা বোজানো বন্ধই করবে, তারপর কি আর গাব্বা সম্পর্কে ইনফরমেশন জোগাড় করার দরকার আছে?'

'আগে বন্ধ তো করুক।'

'তোমার কি কোনও সন্দেহ আছে?'

নিশানাথ চোখ সরু করে বললেন, 'আজকাল যারা পলিটিকস করে, তাদের পেটে যা থাকে, মুখে তার উলটোটা বলে। এদের আমি বুঝতে পারি না।'

সত্যবান কয়েক লহমা স্থির দৃষ্টিতে নিশানাথের দিকে তাকিয়ে থেকে আচমকা তোপ দাগার মতো আওয়াজ করে হেসে ওঠেন। হাসির তোড়ে তাঁর শরীর বেঁকেচুরে যেতে থাকে। তারই মধ্যে বলে ওঠেন, 'তোমার কথাটা কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি। মিউনিসিপ্যালিটিকে জানিয়ে যদি কাজ না হয়, আমাদেরই নতুন একটা লাইন অফ অ্যাকশন ভেবে বার করতে হবে। সেজন্যে গাল-কাটা গাব্বা সম্পর্কে ইনফরমেশন দরকার। অ্যাম আই রাইট?'

নিশানাথ উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখ দু'টো আরও সরু হয়ে গেল।

ঠিক হল, দু'দিন বাদে 'সুরক্ষা'র তিনজন মেম্বার মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে যাবেন। তার আগে সত্যবান শ্যামাদাস চক্রবর্তীকে ফোন করে জেনে নেবেন, কখন গেলে তাঁর অসুবিধা হবে না।

সত্যবানের সঙ্গে শ্যামাদাসের পরিচয় আছে।

শ্যামাদাস চক্রবর্তী বিকেল সাড়ে তিনটেয় সময় দিয়েছিলেন। সেইমতো দু'দিন পর সত্যবানরা মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে পৌঁছে গেলেন।

তাঁদের টিমে যে তিনজন রয়েছেন তাঁরা হলেন পরমেশ ধর, নিশানাথ ভট্টাচার্য এবং সত্যবান নিজে। সবাই বয়স্ক, নানা দায়িত্বশীল পদে কাজ করার পর অবসর নিয়েছেন। দলে অল্পবয়সীদের নেওয়া হয়নি।

মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংটা রাজানগরের মাঝামাঝি এলাকায়। বিশাল তেতলা বাড়ি। সামনের দিকে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানে পনেরো ষোলোটা

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মারুতি, অ্যাম্বাসাডর, টাটা সুমো থেকে জিপ, মাটাডর ভ্যান এবং ছোটখাটো ট্রাক। তাছাড়া বেশ ক'টা টু-হুইলারও।

এখনও ছুটি হয়নি। এমপ্লয়িরা তো রয়েছেই, তাছাড়া নানা দরকারে এসেছে প্রচুর লোকজন। চারদিকে তুমুল ব্যস্ততা, হইচই। সব মিলিয়ে অফিস বিল্ডিং সরগরম।

এখানে আগে আরও বারকয়েক এসেছেন সত্যবান। তিনি জানেন, কোন ফ্লোরে চেয়ারম্যানের কামরা। এই বিল্ডিংয়ে লিফট নেই। সঙ্গীদের নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে তিনি তিনতলায় চলে এলেন।

চেয়ারম্যানের ঘরের দরজা খোলা, তবে সামনে একটা পর্দা ঝুলছে। পর্দাটা সামান্য ফাঁক করে সত্যবান বললেন, 'ভেতরে আসতে পারি?'

'আসুন আসুন—' তক্ষুনি সাড়া পাওয়া গেল।

সত্যবানরা ঢুকে পড়লেন।

কামরাটা বেশ বড় মাপের। দামি সেক্রেটারিয়েট টেবল, চেয়ার, দেওয়ালজোড়া আলমারি, জুট কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে ফিটফাট সাজানো। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও রয়েছে, কিন্তু শীত পড়ার আগে আগে এই সময়টা সেগুলো চালানোর দরকার হয়নি। এয়ার-কন্ডিশনার ছাড়াও সিলিং থেকে দু'টো ফ্যান ঝুলছে। সেগুলো অবশ্য চলছে, তবে খুব আস্তে আস্তে।

সেক্রেটারিয়েট টেবলটা কামরার ঠিক মাঝখানে। সেটার একধারে কম্পিউটার, আরেক ধারে তিনটে ফোন, মোবাইল ছাড়াও বেশ কিছু ফাইল।

টেবলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারে যিনি বসে আছেন তিনিই চেয়ারম্যান শ্যামাদাস চক্রবর্তী। বয়স ষাট-বাষট্টি। মাঝারি হাইট। চুল এখনও সেভাবে পাকেনি, বেশির ভাগটাই কালো। গায়ের রং টকটকে। পরনে দুধসাদা ধুতি এবং পাঞ্জাবির ওপর হালকা রংয়ের ঢোলা একটা জহর কোট, চোখে সরু ফ্রেমের বাই-ফোকাল চশমা।

গোল ধরনের মুখে ভালমানুষি আর সারল্যের ছাপ। এই মুখটার পেছনে অন্য কোনও চতুর মুখ লুকানো আছে কিনা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

সত্যবানদের দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন শ্যামাদাস। হাসিমুখে বললেন, 'বসুন—'

টেবলের এধারে ভিজিটরদের জন্য ডজনখানেক চেয়ার রয়েছে। সত্যবানরা বসে পড়েন।

শ্যামাদাস নিজেও বসতে বসতে বললেন, 'আপনার জন্যে এই সময়টা ফাঁকা রেখেছি। অনেকে দেখা করতে চেয়েছিল, তাদের বারণ করে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ।'

শ্যামাদাস পরমেশ আর নিশানাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এঁদের তো চিনতে পারলাম না।'

সত্যবান তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্যামাদাস এবার জিজ্ঞেস করেন, 'হঠাৎ আমার কাছে এলেন। এনি প্রবলেম?'

সত্যবান আস্তে মাথা নাড়েন।—'হ্যাঁ, সমস্যাটা বেশ বড় রকমেরই।'

শ্যামাদাস কোনও প্রশ্ন করেন না। জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকেন।

সত্যবান সবিস্তার সনেকপুরের জলা বোজানোর কথা জানালেন। তবে কিভাবে, কার কাছ থেকে খবর পেয়ে ওখানে ছুটেছিলেন, সেটা আর বললেন না।

কয়েক লহমা চুপ করে থাকেন শ্যামাদাস। তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না।'

'জানা উচিত ছিল। সনেকপুর কিন্তু রাজানগর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যেই পড়ে। আর আপনি তার চেয়ারম্যান।' চড়া সুরে নয়, বেশ নরম গলাতেই বলেছেন সত্যবান, তবু তার মধ্যে দৃঢ়তা ফুটে বেরিয়েছে।

শ্যামাদাস বললেন, 'আপনার কথা ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট ঠিক। কিন্তু আমাদের মিউনিপ্যালিটির স্টাফ কম। কাজের প্রেসার প্রচণ্ড। তাই এত বড় মিউনিসিপ্যাল এরিয়ার সব দিকে নজর রাখা প্রায় অসম্ভব।' একটু থেমে ফের শুরু করেন, 'আপনাদের অর্গানাইজেশন 'সুরক্ষা' পরিবেশ-টরিবেশ নিয়ে কাজ করে। তাই খবরটা—'

শ্যামাদাসকে থামিয়ে দিয়ে সত্যবান বললেন, 'আমাদের কথা থাক। জলাটা বাঁচাতে হলে এখনই কিন্তু আপনাদের কাজে নেমে পড়তে হবে।'

শ্যামাদাস তক্ষুনি সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দু-চার দিনের ভেতর আমাদের দু'জন অফিসারকে সনেকপুরে পাঠাব। তিনি রিপোর্ট দিলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'খুব ভাল কথা। তবে আপনাকে আরও কিছু জানানো দরকার।'

শ্যামাদাস উৎসুক হলেন।—'বলুন।'

সত্যবান বললেন, 'আমি যেটুকু শুনেছি, ওই ওয়াটার-বডিটা বোজানোর পেছনে একটা খুব পাওয়ারফুল চক্র রয়েছে। তাদের হয়ে কাজটা করছে এই অঞ্চলের ড্রেডেড গানম্যান গাল-কাটা গাব্বা আর তার গ্যাং।'

লহমার জন্য শ্যামাদাসের চোখেমুখে অস্বস্তির ছায়া পড়েই মিলিয়ে যায়। সেটা লক্ষ করেছিলেন সত্যবান। জিজ্ঞেস করলেন, 'এই নোটোরিয়াস ক্রিমিন্যালটাকে আপনি চেনেন?'

যেন ভীষণই অবাক হয়েছেন, এমন ভঙ্গিতে শ্যামাদাস বললেন, 'চিনব! কী বলছেন আপনি! চেনা তো দূরের কথা, নামই শুনিনি।'

সত্যবানের সঙ্গীরা এতক্ষণ নীরবে দু'জনের কথা শুনছিলেন। এবার নিশানাথ ভট্টাচার্য বললেন, 'আমরা জানতে পেরেছি, গাল-কাটা গাব্বার একটা পলিটিক্যাল কানেকশন আছে।'

ভুরুতে সামান্য ভাঁজ পড়ে শ্যামদাসের। নিশানাথের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মানে?'

নিশানাথ তাড়াহুড়ো করলেন না। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন, 'শ্যামাদাসবাবু, আজকাল একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও জানে, বন্দুকবাজ ক্রিমিনালরা কোনও না কোনও পার্টিতে শেলটার নিয়েছে। পার্টিগুলো নিজেদের ইন্টারেস্টে এদের কাজে লাগায়। তার বদলে ওদের যা কিছু করার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। খুন-জখম-ছেনতাই, ওরা যা খুশি করুক, পার্টিগুলো চোখ বুজে থাকে। পুলিশ বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষমতা নেই তাদের গায়ে একটা আঁচড় কাটে। এই গাল-কাটা গাব্বার ডেফিনিটলি কোনও পলিটিক্যাল গড-ফাদার আছে, নইলে সনেকপুরের জলাটা বোজানোর সাহস হতো না। আপনিও তো পার্টি করেন—'

দেবশিশুর মতো মুখ করে শ্যামাদাস বললেন, 'আপনাদের স্পষ্ট করে বলছি, আমরা কোনও অ্যান্টি-সোশাল পুষি না। দরকার হয় না।'

সত্যবানরা থতমত খেয়ে যান। তাঁরা উত্তর দেবার আগেই শ্যামাদাস ফের বলে ওঠেন, 'আমাদের পার্টির পেছনে পিপলের সাপোর্ট আছে। জনগণের জন্যে আমরা কাজ করি। সেটা তারা খুব ভাল করেই জানে।'

চেয়ারম্যান কতটা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কিংবা বিরক্ত, তাঁর মসৃণ মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই। নিশানাথ বিব্রত বোধ করেন।—'আমি কিন্তু পার্টিকুলারলি আপনাদের পার্টি সম্পর্কে কিছু বলিনি। দেশে রাজনৈতিক দলের তো অভাব নেই। তাদের কেউ গাল-কাটা গাব্বাকে নিশ্চয়ই শেলটার দিয়েছে। আমার কী ধারণা জানেন?'

'কী?'

'সেই পার্টিটাকে আগে খুঁজে বার করতে হবে। তারা যদি ওয়াটার-বডি বোজাবার ব্যাপারে গাল-কাটা গাব্বাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে, পিপলকে তা জানাতে হবে। যে পার্টিই ওর পাশে থাকুক, প্রকাশ্যে এই বেআইনি কাজ

সাপোর্ট করবে না, পিপলের রি-অ্যাকশনের ভয়ে গাব্বাকে থামিয়ে দেবে। সনেকপুরের জলাটাও বেঁচে যাবে।' নিশানাথ বলতে লাগলেন, 'আসলে নেক্সট ইলেকশনের খুব বেশি দেরি নেই। এ-সময় কোনও পার্টিই চাইবে না, তাদের নাম কোনও বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যাক।'

একটু চুপচাপ।

তারপর শ্যামাদাস রীতিমতো জোর দিয়ে বললেন, 'এত বড় একটা অন্যায় কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। মিউনিসিপ্যালিটি সনেকপুরের জলাভূমিটা রক্ষা করবেই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।'

সত্যবান বললেন, 'শ্যামাদাসবাবু, আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, জলাটার যে অংশটুকু বোজানো হয়েছে, বালি খোয়া রাবিশ-টাবিশ তুলে সেটা আবার আগের মতো করে দিতে হবে।'

শ্যামাদাস বললেন, 'অবশ্যই।'

'যাক, দুর্ভাবনা কাটল। এই সঙ্গে আপনাকে আরও কিছু জানাতে চাই—'

'বেশ তো।'

সত্যবান বললেন, 'আমাদের 'সুরক্ষা'র পক্ষ থেকে চারপাশে কত ওয়াটার-বডি আছে তার একটা লিস্ট তৈরি করছি। এর মধ্যে কিছু বোজানো হয়েছে কিনা, তারও খবর নিচ্ছি। লিস্টটা বানানো হয়ে গেলে তার একটা কপি আপনাকে দেব।'

'নিশ্চয়ই দেবেন। ওটা পেলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে। জলা জায়গা প্রিজার্ভ করতে না পারলে পরিবেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল। আবার দেখা হবে। আজ চলি—'

'আসুন।'

রাস্তায় বেরিয়ে সত্যবান বললেন, 'শ্যামাদাসবাবুকে বেশ সিরিয়াস মনে হল। আশা করি, কাজ হবে।'

পরমেশ ধরও বেশ সন্তুষ্ট। বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

নিশানাথ একটু খুঁতখুঁতে ধরনের। কেউ কিছু বলল, টপ করে তিনি তা বিশ্বাস করে ফেললেন, এটা তাঁর স্বভাবে নেই। বললেন, 'আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, যারা পলিটিক্স করে, নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে তাদের কথার সঙ্গে কাজের মিল থাকে না। শ্যামাদাসবাবু অ্যাসিওর করেছেন বটে জলাটা বাঁচাবেন, তবে কিছুদিন ওয়েট করে দেখা যাক কতটা কী করেন।'

সত্যবান হেসে ফেললেন, 'তোমার ভীষণ সন্দেহবাতিক। অল রাইট, অপেক্ষাই করা যাক।'

'মাঝে মাঝে সনেকপুরে গিয়ে জলাটা দেখে আসতে হবে, চেয়ারম্যান ফল্‌স্‌ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিনা। আমাদের দেশে পলিটিসিয়ানরা অ্যাসিওরেন্সের তারাবাজি ফোটাতে ওস্তাদ। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। পৃথিবীর কোনও কান্ট্রির নেতারা এত কথা বলে না।'

'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ।'

একটু ভেবে নিশানাথ বললেন, 'একটা বিষয়ে আমার খটকা থেকেই যাচ্ছে।'

'কী সেটা?' সত্যবান জিজ্ঞেস করেন।

'গাল-কাটা গাব্বার ব্যাপারে শ্যামাদাসবাবু বোধ হয় ঠিক বলেননি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সত্যবান।

নিশানাথ বলতে লাগলেন, 'এই এলাকায় পলিটিকস করে করে লোকটা চুল পাকিয়ে ফেলল, আর বলছে কিনা গাব্বা কোন পার্টিতে নাম লিখিয়েছে সে জানে না! কোন পার্টিতে কে ঢুকছে, কে বেরুচ্ছে, অপোনেন্টের স্ট্রেনথ কতটা, কী তাদের স্ট্র্যাটেজি—এসব না জানলে ইলেকশন জেতা যায়?' একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, 'লোকটা গাব্বার খবর ঠিকই রাখে। ভালমানুষের মতো মুখ করে আমাদের এড়িয়ে গেল।'

নিশানাথের মাথা থেকে সন্দেহ তাড়ানো সহজ নয়। কী আর বলা যায় তাঁকে? সত্যবান সামান্য হাসলেন শুধু।

নয়

শ্যামাদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে আসার পর দিন দশেক পেরিয়ে গেছে।

পৃথিবী নামে এই গ্রহের আহ্নিক গতির নিয়মে দিন কেটে যাচ্ছে সত্যবানের। একই রুটিনে। কোনওরকম হেরফের নেই। এর মধ্যে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দু'দিন তিনি সবান্ধবে সনেকপুরে গিয়েছিলেন। হাফেজ আলি, জন নিরাপদ বিশ্বাস কি গোবিন্দ মণ্ডলরা জানিয়েছে, গাল-কাটা গাব্বারা আর ওধারে যায়নি। তবে মিউসিনিপ্যালিটির দু'জন অফিসার জলার অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। কিন্তু রাবিশ টাবিশ তুলে পুরনো চেহারায় সেটা ফিরিয়ে আনার কোনও উদ্যোগ এখনও নেওয়া হয়নি। তবে শ্যামাদাস যখন লোক পাঠিয়েছেন, আজ হোক কাল হোক, কাজ শুরু হবে। আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। আশা করা যায়, শ্যামাদাস তাঁর কথা রাখবেন।

আজ রবিবার। সকালে ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে ব্রেকফাস্ট করতে করতে হঠাৎ রজত আর রিনির চিন্তাটা মস্তিষ্কের কোনও গোপন কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এল। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানোটা তাঁর চিরকালের স্বভাব। সেটা ভেতর থেকে অবিরল খোঁচাতে লাগল। রজতদের সমস্যাটার সুরাহা করা দরকার। ওদের দু'জনের বাপ একটুকরো জমি নিয়ে শিং উঁচিয়ে পরস্পর সেই কবে থেকে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে! বছর এগারো লড়াইটা চলছে। আরও কতদিন চলবে, কে জানে। যতদিন ওরা বেঁচে আছে, মহাযুদ্ধ শেষ হবে কিনা, তার ঠিকঠিকানা নেই। এই জাঁতিকলে পড়ে ছেলেমেয়ে দু'টোর দম আটকানো অবস্থা।

খেতে খেতে মনস্থির করে ফেললেন সত্যবান। মাথায় যখন চিন্তাটা চেপে বসেছে, আজই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। কোনও কিছু ফেলে রাখা তাঁর ধাতে নেই। লোহা গরম থাকতে থাকতে হাতুড়ির বাড়ি মারাটা খুবই জরুরি।

বাঁ হাতে মোবাইল ফোন তুলে নিয়ে রিনির বাবা বিনায়ক দত্তকে ধরে ফেললেন সত্যবান।

ওপ্রান্ত থেকে বিনায়কের গলা ভেসে আসে, 'কী ব্যাপার সত্যবানদা, এই সকালবেলায় হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল! আমি এমন কিছু প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ নই।'

'আজকের প্রাতঃকালটার জন্যে তোকে স্মরণ না করে উপায় নেই।'

একটু যেন থতিয়ে গেলেন বিনায়ক। 'আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।'

'আমি তোর বাড়িতে আসছি। আধ ঘণ্টার মতো আমাকে সময় দিতে হবে। তখন সব বুঝিয়ে বলব—'

'আপনি আসবেন!'

'কেন, তোর আপত্তি আছে?'

বিনায়ক যেন হকচকিয়ে গেলেন, 'না না, এ কী বলছেন! আপনি আসবেন, এ তো আমাদের সৌভাগ্য।' একটু চুপ করে থেকে ফের বললেন, 'সকালবেলা সাইকেলে চেপে বেড়িয়ে এসেছেন। খুব ধকল গেছে। আমিই বরং আপনার বাড়ি যাচ্ছি—'

'নো নো—' সত্যবান বললেন, 'দরকারটা আমার। আমাকেই যেতে হবে। তোর বাড়ি তো আর মঙ্গল গ্রহে নয় যে সেখানে পৌঁছতে ভীষণ একটা পরিশ্রম হবে।'

হাল ছেড়ে দিলেন বিনায়ক। 'ঠিক আছে, আসুন তা হলে—'

সত্যবানদের 'শান্তিনিবাস'-এর সামনে তিরিশ ফুট চওড়া রাস্তা। তার ওধারে বিনায়কদের বাড়ি। 'রোজ ভিলা'। রাস্তা পেরিয়ে সেখানে চলে এলেন সত্যবান।

গেটের সামনে তাঁর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন বিনায়ক। বললেন, 'আসুন আসুন—'

সত্যবান লঘু সুরে বললেন, 'একেবারে রাজকীয় অভ্যর্থনা। ঝানু ল'ইয়ার সব কাজকর্ম ফেলে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আছে—ভাবা যায়!' তিনি জানেন বিনায়ক তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাই বলে গেটের সামনে অপেক্ষা করবে, এটা বেশ বাড়াবাড়িই। আচমকা তিনি আসবেন, মাত্র কয়েক মিনিট আগে জানিয়েছেন। তাই বোধহয় টেনশনে বাইরে চলে এসেছে।

বিনায়ক ধুরন্ধর মানুষ। তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি। হেসে হেসে বললেন, 'রাস্তার এধারে ওধারে দু'জন থাকি। অথচ কতদিন পর এলেন। একটু খাতিরটাতির না করলে চলে! নইলে পরে হয়তো আসবেনই না।'

'খুব হয়েছে। চল এখন—'

গেট থেকে পাথরে-বাঁধানো একটা প্যাসেজ যেখানে গিয়ে ঠেকেছে সেটা ফুলের বাগান। সত্যবানের মতো বিনায়কেরও খুব বাগানের শখ। তবে তাঁর বাগানে শুধু এক ধরনেরই ফুল—গোলাপ। নানা রঙের গোলাপে গোলাপে

বারো শো স্কোয়ার ফিটের মতো জমি ছয়লাপ হয়ে আছে। বাগানটা থেকে মিষ্টি সুঘ্রাণ উঠে আসছে।

বাগানের ধার ঘেঁষে ডান দিকে ক'পা গেলেই মূল বাড়িতে ঢোকার দরজা। দরজার দু'টো বড় বড় পাল্লাই খোলা রয়েছে।

বাড়ির একতলায় বিনায়কের মস্ত চেম্বার। সেটার পাশে একটা ড্রইং রুমও রয়েছে। সেটা বাইরের লোকদের জন্য। বিনায়ক সোজা তাঁকে দোতলায় নিয়ে এলেন। এখানে আছে বিরাট হল-ঘর। তার এক ধারে মস্ত ডাইনিং টেবল, অনেকগুলো চেয়ার। আরেক দিকে দু'সেট সোফা দিয়ে সাজানো চমৎকার বসার জায়গা। এছাড়া টিভি, মিউজিক সিস্টেম, দেওয়ালে দামি দামি পেইন্টিং ইত্যাদি। আত্মীয়-পরিজন এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যারা, তাদেরই শুধু এখানে আনা হয়। হল-ঘরটার তিন দিকে বেশ ক'টা বেডরুম, কিচেন, স্টোর। দক্ষিণ দিকটা একেবারে খোলা।

হল-ঘরে বিনায়কের স্ত্রী ভারতী আর রিনি অপেক্ষা করছিল। নিশ্চয়ই বিনায়ক সত্যবানের আসার খবরটা আগেই ওদের দিয়েছেন।

ভারতী পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন কবেই, কিন্তু এই বয়সেও যথেষ্ট সুন্দরী। শরীরে মেদ জমতে দেন নি। ছিপছিপে চেহারা। মহিলা দারুণ হাসিখুশি, আমুদে। সেটা ভালই জানেন সত্যবান। প্রচুর হাসতে পারেন। এই বয়সেও সারা মুখে স্নিগ্ধ সারল্য মাখানো।

ভারতী অনুযোগের সুরে বললেন, 'আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলাম! ছ'মাস পর তবু আমাদের এখানে দাদার পায়ের ধুলো পড়ল।'

একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। সত্যিই বেশ কিছুদিন এ বাড়িতে তাঁর আসা হয়নি। বললেন, 'কী যে বল ভারতী, এই তো সেদিন—'

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ভারতী তাঁর ক্ষোভের মাত্রাটা আরও খানিকটা চড়িয়ে দিলেন। 'সেদিন! পুরো ছ'মাস। আমরা তো কোটি কোটি মাইল দূরের কোনও প্ল্যানেটে থাকি। সেখানে স্পেসশিপে পৌঁছতে এতগুলো মাস লেগে যায়।'

এই গ্রহান্তরে যাবার কথাটা ঘুরিয়ে অন্যভাবে আগে বিনায়ককে বলেছিলেন সত্যবান। হাত তুলে তিনি একরকম আত্মসমর্পণই করলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন থেকে উইকে তিন দিন করে আসব। তোমার মিসাইলগুলো এবার বন্ধ কর।'

ভারতী হেসে ফেললেন। —'কথা দিলেন কিন্তু। উইকে তিন দিন। প্রমিস?'

'একশো বার প্রমিস।'

'না এলে—'

কাঁচুমাচু মুখে সত্যবান বললেন, 'না এলে অশেষ দুর্গতি হবে সেটা বুঝতেই পারছি।' বলতে বলতে তাঁর চোখ গিয়ে পড়ে রিনির দিকে। আগে যখনই তিনি এ বাড়িতে এসেছেন, মেয়েটা খুশিতে ঝলমল করে উঠত। তাঁর গা ঘেঁষে বসে তুমুল হইচই বাধিয়ে দিত। আজ কিন্তু একটা কথাও বলেনি। একটু দূরে দূরে আছে। মুখে ফ্যাকাসে হাসি। তিনি চলে আসায় কেমন যেন নার্ভাস নার্ভাস দেখাচ্ছে। ভীষণ সতর্কভাবে মেয়েটা তাঁকে লক্ষ করছে। তিনি যে আসবেন, খুব সম্ভব রজত তা ওকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। খুব সম্ভব নয়—অবশ্যই। মেয়েটা এম.এ পড়ছে, কিন্তু বাবাকে এখনও ভীষণ ভয় পায়। বিশেষ করে এমন একটা ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে যাদের ফ্যামিলি তাদের ঘোর শত্রুপক্ষ।

সত্যবান চোখের ইশারায় রিনিকে দু'টি সংকেত পাঠালেন। প্রথমত, নার্ভাস হবার কারণ নেই। দু'নম্বরটা হল, আপাতত সে যেন হল-ঘর থেকে চলে যায়।

রিনি কতটা ভরসা পেল, তার অস্বস্তি কতখানি কাটল, মুখ দেখে বোঝা গেল না। তবে সত্যবানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। পায়ে পায়ে হল-ঘর থেকে বেরিয়ে ওধারের একটা বেডরুমে ঢুকে পড়ল।

এরপর ভারতী প্রচুর খাবারদাবার নিয়ে এলেন। খেতে খেতে আড্ডা জমে উঠল। বিনায়কের কাজকর্ম কেমন চলছে, আসছে পুজোর ছুটিতে কোর্ট যখন বন্ধ থাকবে কোথাও বেড়াতে যাবেন কিনা, গেলে পাহাড়ে না সমুদ্রে—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করলেন সত্যবান। বিনায়করাও জানতে চাইলেন সত্যবানের ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার ব্যাপারটা অর্থাৎ জলাভূমি রক্ষা, পরিবেশ বাঁচানোর মতো মহৎ সামাজিক দায়িত্ব পালন কিরকম চলছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনায় কোনায় খুঁজে খুঁজে লক্ষ্মী নাটুদের মতো আরও কারওকে জুটিয়ে নিজের ফ্যামিলি বাড়াবার নতুন কোনও পরিকল্পনা করছেন কিনা, লঘু মেজাজে এইসব প্রসঙ্গও উঠল।

নানা এলোমেলো কথার ফাঁকে হঠাৎই যেন মনে পড়েছে, এমন ভঙ্গিতে সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোদের সেই ব্যাপারটার এখন কী হাল?'

বুঝতে না পেরে বিনায়ক বলেন, 'কোনটার কথা জানতে চাইছেন?'

'ওই যে কয়েক কাঠা জমি নিয়ে তোর আর মনোতোষের মধ্যে যে শতবর্ষের যুদ্ধটা চলছিল—'

'সেটা যেমন চলছিল তেমনি চলছে। মাঝে মাঝে কোর্টে ডাক পড়ে। আমার তো সময় নেই, আমার একজন জুনিয়রকে পাঠিয়ে দিই। সে-ই কেসটা হ্যান্ডল

করছে। মনোতোষও ওর প্রফেশন নিয়ে ভীষণ বিজি। সেও তার ল'ইয়ার পাঠায়। দুই ল'ইয়ার নেক্সট হিয়ারিংয়ের জন্যে নতুন একটা ডেট নিয়ে আসে। মনোতোষ যদি কেস চালিয়ে যায়, আমি কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' জোরে জোরে অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকান সত্যবান।

বিনায়ক বললেন, 'ওই জমিটা না পেলে আমার কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু এটা প্রেস্টিজের প্রশ্ন। এর শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না।'

সত্যবান বললেন, 'মনোতোষও নিশ্চয়ই তোর মতো ভাবছে?'

একটু থতিয়ে গেলেন বিনায়ক। তারপর বললেন, 'সেটাই স্বাভাবিক। কেসটার সঙ্গে ওরও সম্মান জড়িয়ে আছে।'

'হুঁ, বুঝলাম।' সত্যবান বললেন, 'এভাবে চললে এই লড়াই একশো বছরেও শেষ হবে বলে মনে হয় না। কাগজে দেখেছি ইন্ডিয়ানদের অ্যাভারেজ আয়ু হচ্ছে বাষট্টি কি চৌষট্টি। কেউ কেউ অবশ্য সত্তর আশি নব্বই বছরও বাঁচে। সেসব এক্সসেপশন। সত্যযুগ-টুগে নাকি মানুষ হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকত। কিন্তু এটা কলিযুগ। তোরা কি পাঁচশো সাতশো কি হাজার বছর টিকে থাকতে পারবি?'

সত্যবান কিসের ইঙ্গিতে দিচ্ছেন, চট করে ধরে ফেলেন বিনায়ক।—'যতদিন বেঁচে আছি এই লিগ্যাল ব্যাটলটা চলবেই।'

'তারপর?'

'তারপর যা হবার হবে। রিনি বড় হয়েছে, লেখাপড়াও শেষ করে এনেছে। সে লড়ে যাবে—'

'তার মানে একটা মামলার ইনহেরিটেন্স তাকে দিয়ে যেতে চাইছিস?'

ভারতী চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না, তার ঘর-সংসার হবে না, মামলা লড়ার জন্যে এ বাড়িতে সারাজীবন পড়ে থাকবে। অদ্ভুত মানুষ—' শেষের মন্তব্যটা তাঁর স্বামী সম্পর্কে।

বিনায়ক এমনিতে ভালমানুষ, সহৃদয়, বিচক্ষণ, কিন্তু মনোতোষের সঙ্গে এই মামলাটার ব্যাপারে তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মানুষের মধ্যে, সে যতই বিবেচক ধীর স্থির শান্ত হোক, কোথাও একটা চূড়ান্ত ইঠকারিতা এবং অবুঝপনা লুকনো থাকে। কোনও যুক্তি বা সৎ পরামর্শ তাকে টলাতে পারে না। মনোতোষকে টিট করার চিন্তাটা বিনায়কের মাথায় ফিক্সেশনের মতো আটকে গেছে। একরোখার মতো বললেন, 'এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব, রিনির সঙ্গে সেও মামলাটা চালাবে।'

'সেজন্যে তো ঘরজামাই দরকার। তোমার মনোবাসনা বোধ হয় সেই রকমই।'

'ঘরজামাই হতে হবে কেন? রিনি তার শ্বশুরবাড়িতেই থাকবে। সেখান থেকে কেস লড়া যায় না?'

'তোমার ফরমাশমতো জামাই পাওয়া যাবে? আজকাল ভাল ভাল ছেলেদের বেশির ভাগই চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে বাঙ্গালোর পুনে দিল্লি কি হায়দ্রাবাদে। অনেকেই আমেরিকা ইউরোপ কি কানাডায়। ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে রিনি কি কলকাতায় পড়ে থাকবে মামলা লড়ার জন্যে?'

দু'হাত তুলে সত্যবান বললেন, 'পিস, পিস—শান্তি। গৃহযুদ্ধ একেবারেই নয়।' বিনায়কের দিকে ফিরে বলেন, 'আচ্ছা, এই যে এতকাল ধরে মামলাটা লড়ছিস তাতে এখন অব্দি কত টাকা খরচ হয়েছে?'

বিনায়ক বললেন, 'খেয়াল নেই। তবে দেড় দু'লাখ টাকা তো হবেই।'

'মামলা যখন শেষ হবে, অ্যাট অল যদি হয়, খরচটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?'

'আরও কয়েক লাখ।' সোজাসুজি সত্যবানের চোখের দিকে তাকান বিনায়ক।

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে সত্যবান বললেন, 'কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছিস?'

'কী?'

'বাকি লাইফটা তোকে পার্মানেন্ট টেনশন নিয়ে কাটাতে হবে। বয়েস বাড়লে মানুষ ঘাড় থেকে বাজে ঝঞ্ঝাট ঝেড়ে ফেলতে চায়। তুই কিনা সেটা জাপটে ধরে রেখেছিস! এর কোনও মানে হয়?'

সত্যবান ঠিক কী বলতে চান, বিনায়কের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না। উত্তর না দিয়ে তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

সত্যবান থামেননি। বলেই চলেছেন, 'অনেক লড়াই, অনেক শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয় আর সময় নষ্ট হয়েছে। এবার সিজ-ফায়ার হয়ে যাক।'

'তার মানে আপনি কেসটা তুলে নিতে বলছেন?'

'এগ্‌জাক্টলি।'

'বুঝেছি—' বিনায়কের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে বেরোয়। 'গো-হারা হেরে যাবে বলে মনোতোষ আপনাকে গিয়ে ধরেছে, যাতে আপনি আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মামলাটা উইদড্র করাতে পারেন। তাই না?'

'নো, নো, নট অ্যাট অল—' চড়া গলায় হুংকার ছাড়লেন সত্যবান, 'আমি যে এখানে এসেছি, মনোতোষ তা জানেই না।'

'তবে?' বিনায়ক থতিয়ে যান।

'আমি একটা প্রোপোজাল নিয়ে এসেছি। ভেবে দ্যাখ সেটা তোর মনের মতো হয় কিনা।'

'কী প্রোপোজাল?'

'আন্দাজ কর—'

'না, বুঝতে পারছি না।' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকান বিনায়ক।

'রিনির সঙ্গে মনোতোষের ছেলে রজতের বিয়ে দিয়ে দে। শত্রু আত্মীয় হয়ে গেলে যুদ্ধ আপসেই থেমে যাবে।'

উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলেন বিনায়ক। 'কী বলছেন দাদা! ইট'স অ্যাবসোলুটলি ইমপসিবল—'

'কুল ডাউন, কুল ডাউন—' হাত তুলে বিনায়ককে থামিয়ে দিয়ে সত্যবান যা বললেন তা এইরকম। আর্থিক বা সামাজিক স্টেটাসের দিক থেকে মনোতোষরা বিনায়কদের চেয়ে লেশমাত্র কম নয়। তা ছাড়া রজত ব্রিলিয়ান্ট স্কলার, কলেজের অধ্যাপক, ডক্টরেট হয়েছে। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে বাধা বা অসুবিধাটা কোথায়? সত্যবান বলতে লাগলেন, 'গোঁয়ার্তুমি না করে আমার কথাটা মেনে নে। তোদের দু'পক্ষের ভাল না হলে এমন একটা প্রোপোজাল নিয়ে আমি কক্ষনো আসতাম না। ভেবে দ্যাখ, এই বিয়েটা হলে কারও মর্যাদা নষ্ট হবে না।'

ভারতী অফুরান আগ্রহে সব শুনে যাচ্ছিলেন। উৎসাহে তাঁর চোখমুখ চকচক করছে। বললেন, 'রজত সম্পর্কে আমি জানি। চমৎকার ছেলে। ওর মতো ভাল স্টুডেন্ট রাজানগরে খুব কমই ছিল। শুনেছি প্রফেসর হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছে। রিনির জন্যে এমন ছেলে পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার।'

ভারতী যে তলায় তলায় রজতকে পছন্দ করেন তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি বিনায়ক। শুনেও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। আগুন-ঝরা চোখে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তাঁকে দাবড়ে দিলেন, 'ভাগ্যের ব্যাপার! আমার সাফ কথা—এ বিয়ে হবে না। ওসব মতলব ছাড়। আমার মেয়ের জন্যে পৃথিবীতে রজতের চেয়ে অনেক ভাল পাত্র রয়েছে।'

শান্তশিষ্ট ভালমানুষ ভারতী ধমকে উঠলেন, 'মেয়ে যে বড় হয়েছে সে খেয়াল রাখ! দিনরাত তো ক্লায়েন্ট, মামলা, হাইকোর্ট। রিনির জন্যে রাজপুত্রেরা

কোথায় লাইন দিয়ে রয়েছে? বল—বল—' কণ্ঠস্বর চড়তে লাগল তাঁর, 'কোনও দিন মেয়ের বিয়ের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়েছে এর আগে?'

সত্যবান বললেন, 'থাম ভারতী, থাম—'

ওদিকে বিনায়ক রুখে উঠেছে, 'আমি মেয়ের বাবা। কখন কী করতে হবে, আমার জানা আছে। তোমার অত না ভাবলেও চলবে—'

সত্যবান দু' হাত ওপরে তুলে বললেন, 'মেজাজ গরম করিস না বিনায়ক। ভারতী, রাগারাগি নয়। গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে কী লাভ? তার চেয়ে আমি যা বলছি, মন দিয়ে শোন।'

বিনায়কের চোখ স্ত্রীর দিক থেকে ঘুরে সত্যবানের মুখের ওপর এসে পড়ে। তাঁর মধ্যে প্রচণ্ড একগুঁয়েমি রয়েছে। সেটা মাথায় চাগাড় দিয়ে উঠলে কোনও সৎ পরামর্শই কানে তোলেন না। ফোঁস ফোঁস শ্বাস ফেলতে ফেলতে গলার ভেতর গরগর আওয়াজ করতে লাগলেন।

সত্যবান বলেন, 'তুই হাজার চেষ্টা করলেও এই বিয়ে ঠেকাতে পারবি না।'

প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন বিনায়ক। তারপর লাফিয়ে ওঠেন, 'মানে?'

'অলরেডি রজত তোর ঘরে সিঁদ চালিয়ে দিয়েছে। সে খবর রাখিস?'

রাগটাগ, উত্তেজনা উবে গিয়ে বিনায়কের মুখে কেমন একটা বিমূঢ় ভাব ফুটে ওঠে। 'সিঁদ চালিয়েছে, সেটা কী?'

সত্যবান বললেন, 'আরে বাবা, তোর মেয়ে রিনি আর মনোতোষের ছেলে রজত চুটিয়ে প্রেম করছে। তারা সাফিসিয়েন্টলি অ্যাডাল্ট। প্রাপ্তবয়স্ক যুবক-যুবতী। তোর শুয়োরের গোঁ, ওদের বিয়ে দিবি না। কিন্তু ওরা যদি সোজা ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়ে কাজটা চুকিয়ে ফেলে, ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের পুরো বইটা খাড়া করেও বিয়েটা কি নাকচ করাতে পারবি?'

তাঁর অজান্তে এরকম একটা দুর্ঘটনা যে ঘটে গেছে, কোনও দিন ভাবতেও পারেননি বিনায়ক। ঘাগি আইনজ্ঞটি, যিনি আদালতে ধুরন্ধর সাক্ষীদের জেরায় জেরায় জিভ বার করে ছাড়েন, এই মুহূর্তে তিনি কী বলবেন, ভেবে পান না। একেবারে হতচকিত। বিহ্বলের মতো তিনি শুধু তাকিয়ে থাকেন।

ভারতী বললেন, 'আপনার ভাই যতই আপত্তি করুক, এই বিয়েতে আমি রাজি।' তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ফুটে বেরোয়।

বিনায়ক এতক্ষণে খানিকটা যেন অনুধাবন করতে পারেন, রিনির ব্যাপারটা অনেকখানিই তাঁর হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে। তাঁর বাড়ি তো আর মধ্যযুগের হারেম নয় যে মেয়েকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখবেন। এটা টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি। রিনি ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করতে যায়। ছুটির দিনে

তার বন্ধুরা যেমন এ বাড়িতে আসে, সেও আড্ডা দিতে কিংবা পড়াশোনার ব্যাপারে তাদের বাড়িতে যায়। বাইরে বেরিয়ে সে যদি বিয়েটা সত্যি সত্যিই চুকিয়ে ফেলে, তাঁর পক্ষে আদৌ কিছু করার থাকবে না। এদিকে রাজানগরের মানুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসবে। মিনমিনে গলায় বললেন, 'কিন্তু মনোতোষ—'

সত্যবান আঁচ করে নিলেন, বিনায়কের তেজ মরে গেছে। তিনি মোটামুটি রাজি হয়েছেন। রাজি না হয়ে উপায়ই বা কী। কিন্তু সংশয় মনোতোষ সম্পর্কে, ওই লোকটা বেঁকে বসবে কিনা।

সত্যবান বললেন, 'মনোতোষের দিকটা আমি দেখব। তোর এখান থেকে বেরিয়ে সোজা তার বাড়িতে চলে যাব।'

আরও কিছুক্ষণ কথা টথা বলে বেরিয়ে পড়লেন সত্যবান। কোনও সমস্যা ঝুলিয়ে রাখা তাঁর ধাতে নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা চুকিয়ে ফেলতে চান। রিনি আর রজতের সম্পর্কটা চিরস্থায়ী করার মিশন নিয়ে বিনায়কদের বাড়ি এসেছিলেন। অর্ধেকটা কাজ হয়েছে। বাকিটা আজই তিনি সমাধা করতে চান।

মনোতোষ লাহিড়িদের বাড়িটা রাজানগরের দক্ষিণ দিকের শেষ মাথায়। বিশাল কমপাউন্ডের মাঝখানে প্রকাণ্ড চারতলা বাড়ি। পুরনো ধাঁচের পৈতৃক বাড়িটা ভেঙে ক'বছর হল নতুন বিল্ডিং তৈরি করিয়েছেন মনোতোষ। চোখধাঁধানো স্থাপত্য। বাগানটাগান ছাড়াও বাড়ির পেছন দিকে টেনিস লনও রয়েছে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরের আধাআধি জুড়ে গ্যারাজ। সেখানে রয়েছে তিন-চারটে গাড়ি—মারুতি, টাটা সুমো, অ্যামবাসাডর এবং একটা জিপ। বাকি অর্ধেকটায় কাজের লোকেদের জন্য ক'টা ঘর। দুই অংশের মাঝখানে লিফট।

একটা সাইকেল-রিকশা নিয়ে সোজা সেখানে চলে এলেন সত্যবান। গেটে যে নেপালি দারোয়ানটা শিরদাঁড়া টান টান করে দাঁড়িয়ে ছিল সে ফৌজি কায়দায় স্যালুট হাঁকিয়ে সসম্ভ্রমে বলে, 'নমস্তে সাহাব—'

সত্যবান জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার সাহেব বাড়ি আছে?'

'জি। আইয়ে—'

দারোয়ান লিফটে করে সত্যবানকে চারতলায় মনোতোষ লাহিড়ির কাছে পৌঁছে দেয়।

কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিটে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির বিরাট একটা ফার্ম আছে মনোতোষের। কাজের এত চাপ যে বাড়িতেও নিজস্ব একটা অফিস

বসাতে হয়েছে। ছুটির দিনেও তিনি সেখানে নানা ক্লায়েন্টের হিসেবপত্র নিয়ে বসেন।

আজও কম্পিউটারে চোখ রেখে খুব মন দিয়ে কী দেখছিলেন। সত্যবান তাঁর গমগমে গলায় ডাকেন, 'মনোতোষ—'

মুখ তুলে মনোতোষ প্রথমটা হতবাক। তারপর প্রায় লাফিয়ে ওঠেন, 'সত্যবানদা, আপনি! ঠিক দেখছি তো? চলুন চলুন, ড্রইং রুমে গিয়ে আরাম করে বসি।'

সত্যবান জানেন, পুরো চারতলাটা নিয়ে থাকেন মনোতোষ আর তাঁর স্ত্রী সুতপা। তেতলাটা ওঁদের বড় ছেলে রজতের, দোতলায় থাকে ছোট ছেলে সুনন্দ।

'সুতপা, দেখ কে এসেছেন—' গলা উঁচুতে তুলে স্ত্রীকে ডাকতে ডাকতে সত্যবানকে ড্রইং রুমে এনে বসালেন মনোতোষ।

ওধারের কোনও একটা ঘর থেকে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসে সত্যবানকে দেখে বিস্ময়ে সুতপার চোখ গোল হয়ে গেল। বললেন, 'আরে বাবা, এ কাকে দেখছি!' তারপর বিনায়ক আর ভারতীর মতো একটানা কিছুক্ষণ অনুযোগ করে গেলেন। এতদিন কেন আসেননি সত্যবান, তিনি কি তাঁদের ভুলে গেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্ষোভটোভ মিটিয়ে মনোতোষদের শান্ত করতে খানিকটা সময় লাগল। বিনায়কদের মতো এঁদেরও একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিতে হল। এবার থেকে মাঝে মাঝে আসবেন, চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে যাবেন, ইত্যাদি। তারপর সুতপাকে বললেন, 'এখানে বোসো। তোমার রান্নার লোককে বলে দাও, এক কাপ লেমন টি যেন করে দেয়। আর কিন্তু কিচ্ছু না—'

সুতপা এবং মনোতোষ একসঙ্গে হইচই বাধিয়ে দিলেন। কতদিন পর এসেছেন সত্যবান, শুধু চা খাইয়ে ছাড়া যায়?

সত্যবান হাঁ হাঁ করে ওঠেন। এই সবে খেয়ে এসেছেন। আজ নয়, আরেক দিন সকাল সকাল এসে দুপুরে এবং রাত্তিরে গান্ডেপিন্ডে খেয়ে যাবেন। অন্তত চার রকম মাছ চাই। পাবদা, চিতলের পেটি, ভাপা ইলিশ এবং পাকা রুই। সেই সঙ্গে পাঁঠার মাংসের কালিয়া। রাবড়ি এবং ক্ষীরের পানতুয়া।

'কথা দিলেন কিন্তু—'

'একশো বার।'

রান্নার লোককে দিয়ে না, নিজের হাতে সবার জন্য চা করে নিয়ে এসে সত্যবানের কাছাকাছি বসলেন সুতপা। রংটা একটু চাপা হলেও ভারি সুশ্রী। সারাক্ষণ মিষ্টি হাসিতে তাঁর মুখ আলো হয়ে থাকে।

চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ এলোমেলো নানা গল্প হল। তার ফাঁকে সত্যবান জানতে চাইলেন, রজত আর সুনন্দ বাড়িতে আছে কিনা। সুতপা বললেন, দুই ভাইয়ের কেউই নেই।

মনোতোষ পলকহীন সত্যবানকে লক্ষ করছিলেন। তাঁর মনে একটা খটকা দেখা দিয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রাক্তন মেজরটির হঠাৎই তাঁদের দেখার জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠেনি। নিশ্চয়ই এ বাড়িতে আসার পেছনে তাঁর কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য রয়েছে। বললেন, 'সত্যবানদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

সত্যবান বললেন, 'অবশ্যই।'

'ওয়েটল্যান্ড, এনভায়রনমেন্ট, গাছপালা, পাখিটাখি ফেলে আচমকা আমাদের বাড়ি যে চলে এলেন, সেটা কি শুধু নির্ভেজাল আড্ডা দেবার জন্যে?'

কয়েক লহমা মনোতোষের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন সত্যবান। তারপর ড্রইং রুমে ঝড় তুলে হো হো করে হেসে ওঠেন। হাসতে হাসতেই বলেন, 'তুমি একটি অতি ধুরন্ধর ব্যক্তি। বিরাট বিরাট সব কোম্পানির বাঘা বাঘা টপ একজিকিউটিভদের চরিয়ে খাচ্ছ। ঠিকই ধরেছ, খামোখা গল্প করতে আসিনি।' রগড়ের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগলেন, 'হুঁ হুঁ, একটা গভীর ইনটেনশন নিয়ে এসেছি।'

মনোতোষ হাসলেন, 'কী সেটা?'

'শুনলেই তো তুই চিড়বিড়িয়ে উঠবি।'

'না, না, আপনি বলুন—'

রীতিমতো আটঘাট বেঁধে রজত আর রিনির বিয়ের কথাটা জানালেন সত্যবান।

শুনতে শুনতে মুখটা থমথমে হয়ে গেল মনোতোষের। 'আপনি তো জানেন বিনায়কের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কিরকম। এটা হয় না। হতে পারে না।'

অনেক বোঝালেন সত্যবান কিন্তু ঘাড় বাঁকিয়ে রইলেন মনোতোষ। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, এ বিয়েতে তাঁর মত নেই। শেষ পর্যন্ত মোক্ষম সেই ক্ষেপণাস্ত্রটা ছুড়তে হল যা দিয়ে বিনায়ককে তিনি বাগে এনেছিলেন। অর্থাৎ রিনি আর রজত যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বসে, মনোতোষ কোনওভাবেই আটকাতে পারবেন না।

মনোতোষ এবার থতিয়ে যান। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তেতো বড়ি গেলার মতো করে বললেন, 'কিন্তু বিনায়করা কি রাজি হবে?'

'সে দায়িত্ব আমার। ইন ফ্যাক্ট তোদের এখানে আসার আগে আমি বিনায়কের সঙ্গে দেখা করে এসেছি।'

মনোতোষের চোখেমুখে ঝিলিক খেলে যায়।—'বুঝেছি, আজকাল পরিবেশ টরিবেশের পাশাপাশি ঘটকালিটাও তা হলে করছেন।'

সত্যবান তরল গলায় বললেন, 'না করে উপায় কী? দশ বছর ধরে দু'জনে রাস্তার ষাঁড়েদের মতো শিংয়ে শিং লাগিয়ে ফাইট দিয়ে যাচ্ছিস। রাজানগরের মানুষ এই নিয়ে হাসাহাসি করে। সেটা জানিস?'

মনোতোষ চুপ করে রইলেন।

সত্যবান বলতে লাগলেন, 'তোরা এখানকার রেসপেক্টেবল সিটিজেন। কিন্তু লাফিং স্টক হয়ে উঠেছিস।' একটু থেমে ফের শুরু করলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। ভাবলাম, তোদের থামানো দরকার। তাই সিজ-ফায়ারের ফরমুলা ঠিক করে মাঠে নেমে পড়েছি।'

সুতপার পেটে হাসি যেন কুলকুল করছিল। সেটা এবার প্রায় উপচে বেরিয়ে আসে। চোখ দু'টো ঝিকমিক করতে থাকে। বললেন, 'রিনির মতো মেয়ে হয় না। ও এ বাড়ির বউ হলে চমৎকার হবে।'

চমকে স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরান মনোতোষ।—'মেয়েটার সম্পর্কে তো ঢালাও সার্টিফিকেট দিয়ে বসলে। ওকে তুমি কতটুকু চেনো?'

সুতপা এবার এক মেগাটনের বোমা ফাটালেন। 'খুব ভাল করেই চিনি। তোমরা যখন দুপুরবেলা বেরিয়ে যাও, ইউনিভার্সিটিতে ছুটি থাকলে রিনি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রী, ভারি সুন্দর দেখতে, কী মিষ্টি কথাবার্তা, নম্র, ভদ্র, এমন মেয়ে আমি খুব বেশি দেখিনি।'

দশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ যেন খেলে গেল মনোতোষের সারা শরীরে। মস্তিষ্ক কিছুক্ষণ অসাড় হয়ে রইল। তারপর সেটা খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। তার অজান্তে রিনি যে এ বাড়িতে যাতায়াত করছে, এই প্রথম জানতে পারলেন। স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'মেয়েটা তোমার কাছে আসে, আগে বলনি তো?'

'বলিনি অশান্তির ভয়ে—' সুতপা বললেন, 'শুনলে চেঁচিয়ে মেচিয়ে সারা রাজানগর তোলপাড় করে ফেলতে। সেটা আমি চাই নি। কী ভেবেছিলাম জানো?'

বিমূঢ়ের মতো মনোতোষ জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'তুমি কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি হবে না। বিনায়কবাবুও ঘাড় বাঁকিয়ে থাকবেন। তোমরা তোমাদের রেষারেষি, জেদ নিয়ে থাকো। আমি আর রিনির

মা ভারতী, দু'জনে ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন অফিসে নিয়ে গিয়ে রিনি আর বাবুলের বিয়ে দেব। তোমরা লাঠালাঠি ফাটাফাটি কর। ছেলেমেয়ে দু'টোর সাধ-আহ্লাদ বলে তো একটা ব্যাপার আছে।' রজতের ডাক-নাম বাবুল।

অনেকক্ষণ স্ত্রীর দিকে হতবাক তাকিয়ে থাকেন মনোতোষ। তারপর বলেন, 'ভারতীর সঙ্গে এ নিয়ে তোমার কথা হয়েছে নাকি?' ভারতী রাজানগরেরই মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে চেনেন মনোতোষ।

'রোজই কথা হয়। আমার সেল ফোনটা আছে কী করতে?'

সত্যবানও বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন। রজত যেমন বিনায়কের কেল্লায় ফাটল ধরিয়ে চুপিসারে তাঁদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে, মনোতোষের বাড়িতেও তেমনি চোরাবানের মতো ঢুকে গেছে রিনি। চমকে দেবার মতো ঘটনা। তার চেয়েও বড চমক, ভারতী আর সুতপা তাদের স্বামীদের অজান্তে, গোপনে বিয়ের ব্যবস্থা করেই ফেলেছে। বিনায়ক এবং মনোতোষ ষড়যন্ত্রটা টেরই পান নি।

'হুঁ—' মনোতোষকে কেমন যেন বিধ্বস্ত দেখায়। এলিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে সত্যবানকে বললেন, 'এরপর আমার আর কিছু বলার নেই। সত্যবানদা, যা ভাল মনে করেন তাই করুন।'

রজত আর রিনি এবং তাদের মায়েরা কাজটা অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে। সত্যবান বললেন, 'ঠিক আছে।'

দশ

আজ প্রাতর্ভ্রমণের পর বাজারে এলেন সত্যবান। সঙ্গে রয়েছে যিশু। তার আজ কলেজ ছুটি। তাই খানিকটা বাড়তি সময় সত্যবানের সঙ্গে কাটাতে পারবে। যাদের কলেজ ইউনিভার্সিটি বা অফিসে ছুটি নেই, তারা রাস্তা থেকেই হাত নাড়তে নাড়তে বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

মাছ, আনাজটানাজ কিনে হাজারি বুড়ি আর চম্পার কাছে চলে এলেন সত্যবানরা। হাজারিরা অন্যদিনের মতো তিন-চারটে ঝুড়ি, ধামা আর বেতের চাঙারিতে নানারকম ফলপাকড় সাজিয়ে বসেছে। কলা, পেঁপে, শসা, পেয়ারা তো আছেই, তাছাড়া অন্য প্রভিন্সের চালানি বেদানা, আপেল, কমলা ইত্যাদিও রয়েছে। বিকিকিনি চলছে পুরোদমে।

সত্যবানকে দেখে মুখ আলো হয়ে ওঠে হাজারির। চম্পাও ভীষণ খুশি। ফৌজি এই অফিসারটির সঙ্গে যখনই দেখা হয়, ঠাকুমা আর নাতনির আনন্দ উপচে পড়ে।

শশব্যস্ত হাজারি বলে, 'আসেন বড়বাবা, আসেন।' সপ্তাহের কোন কোন দিন সত্যবান বাজার করতে আসেন সেটা তার ভালই জানা আছে। সত্যবানের জন্য সেরা ফলগুলো আলাদা করে রাখে সে, অন্য খদ্দেরদেব তা ছুঁতে দেয় না।

সত্যবানের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে শসা, কলা, বেদানা টেদানা ভরতে লাগল হাজারি। চম্পাও তার সঙ্গে হাত লাগায়।

সেই যে ক'দিন আগে চম্পার বিয়ের কথা শুনে গিয়েছিলেন সত্যবান, সেটা তাঁর মাথায় ঠিকই আছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'নাতনির বিয়ের ব্যাপারটা আর কতদূর এগুলো? কলকাতা থেকে সেই মমতাদিদি তোমাদের গোপীগঞ্জে আর এসেছিল?'

হাজারি ঘাড় হেলিয়ে জানায়, 'হ্যাঁ, কালই দেকা কইরে গেচে।'

'হুঁ। কী বললে?'

'আজ হল গে মাসের বারো তারিক। দশদিন বাদে ঝে তারিকটা পড়বে সিটি নাকিন খুব ভাল। সিদিন বে' হলি বর-কনের জেবন সুকে (সুখে) কেটি যায়। কক্ষনো অশান্তি হুজ্জুৎ হয় না। দু'জনার একশো বচ্ছর পরমায়ু হয়।'

সত্যবান বললেন, 'সে না হয় বুঝলাম, তা যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা, কাল কি তাকে সঙ্গে করে এনেছিল?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে হাজারি, 'না।'

'কার সঙ্গে বিয়ে হবে তাকে দেখার দরকার নেই?'

মুখ চুন করে হাজারি বুড়ি বলল, 'আনতি তো বলেছিনু, তা বুললে পাত্তর একন ছুটি পাবেনি। বে'র আগের দিন আসবে, তারপর শুভকাজ চুইকে (চুকিয়ে) চাকরির জায়গায় ফিরে যাবে।'

একটু ভেবে সত্যবান বললেন, 'তোমার নাতনি ছাড়াও আশপাশের আরও ক'টা মেয়ের বিয়ে তো ঠিক করেছে মমতাদিদি। তাদের মা-বাপকেও নিশ্চয়ই ছেলে দেখিয়ে যায়নি?'

'না। আমার মতো ওদেরও বুলেচে, পাত্তর বে'র আগের দিন আসবে।'

'বুঝেছি।' সত্যবান বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে?'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—' হাজারি বুড়ি বলল, 'কলকেতায় পাত্তরদের মা-বাপের ঠিকানা নিকিয়ে (লিখিয়ে) নিতি বুলেছিলেন তো?'

'হ্যাঁ। লিখে দিয়েছে?'

'পেরথম দিতি চাইছেল না। বুলছিল, তোমরা আমারে বিশ্বাস কর না? আমি তোমাদের আপনার নোক নয়? তভু আমি ছাড়িনি। শেষ অব্দি নিকে (লিখে) দেচে। এই লিন—' আঁচলের গেরো খুলে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বার করে সত্যবানের হাতে দিল সে।

কাগজটার ভাঁজ খুলতেই ক'টা নাম এবং ঠিকানা চোখে পড়ল সত্যবানের। আনন্দ, প্রকাশ, সত্যেন, ব্রজ ইত্যাদি। সারা কলকাতার নানা জায়গায় এদের ঠিকানা ছড়িয়ে আছে। নাম এবং পদবিগুলো দেখে বাঙালিই মনে হচ্ছে।

হাজারি সমানে বকে যাচ্ছিল, 'মমতাদিদি বুলছেল, আমাদের পেচনে নাকিন নোক (লোক) পড়েচে। তারা নাম-ঠিকানা চেইয়ে চেইয়ে (চেয়ে চেয়ে) আমাদের নাচাচ্চে।'

তার কথার জবাব না দিয়ে সত্যবান কাগজটা নিজের পকেটে পুরে বললেন, 'এটা আমার কাছে থাক।'

'থাক না। আপনার জন্যিই তো এনিচি।'

'আচ্ছা, যে ছেলের সঙ্গে চম্পার বিয়ে ঠিক হয়েছে তার কী নাম?'

'অনিল।'

সত্যবান বললেন, 'আজ হল বুধবার। শুক্রবার বাজার করতে আসব। এর ভেতর তোমার মমতাদিদি যদি গোপীগঞ্জে যায়, বিয়ে ঠিক করে ফেলো না। তাকে বলবে এত তাড়াহুড়ো করে কিছু করা যাবে না। মনে থাকবে?'

হাজারি বুড়ি অক্ষরপরিচয়হীন গ্রামের মানুষ হলেও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। বলল, 'বুজিচি, আপনারে না জিগুয়ে (জিজ্ঞেস করে) কিচু করবনি।'

'আর যে সব মেয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে তাদের মা-বাপকেও বলে দিও, আমি যতদিন না বলছি, এই নিয়ে তারা যেন না এগোয়।'

'আচ্চা বড়বাবা—'

ফলের দাম মিটিয়ে যথারীতি পাশের তেঁতুলতলায় চলে এলেন সত্যবান আর যিশু। মথুরানাথ, গঙ্গাধর, ভবতারণরা উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে আছেন। ফি সপ্তাহের সোম, বুধ আর শুক্রবার যেমনটা দাঁড়িয়ে থাকেন। তবে ভানুমতী ভট্টাচার্যকে দেখা গেল না। মাসে মাত্র দু'দিন তিনি আসেন।

গঙ্গাধরদের আনাজ মাছটাছ দিয়ে সাইকেলে উঠে পড়েন সত্যবানরা।

সন্ধেবেলায় 'সুরক্ষা'র অফিসে সত্যবানের সহযোদ্ধারা জড়ো হলে তিনি চম্পা এবং গোপীগঞ্জের চারপাশের গ্রামগুলোর ক'টা মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে সবিস্তার জানিয়ে বললেন, 'আমার ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মনে হচ্ছে মমতা নামে মেয়েমানুষটি কোনও একটা র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত। বিয়ে হলে গ্রামের ওই সাদাসিধে মেয়েগুলোর হয়তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

পরমেশ ধর লঘু সুরে বলে ওঠেন, 'আপনি পারেনও বটে। দৌড়ঝাঁপ করে রিনি আর রজতের দুই ত্যাঁদড় বাপকে এই সবে বাগে নিয়ে এলেন। দু'চার মাসের ভেতর আশা করি বিয়েটা হয়ে যাবে। পারফেক্ট মধুর মিলন। সেটা মিটতে না-মিটতেই আরও চোদ্দটা বিয়ের প্রবলেম জুটিয়ে আনলেন!'

সত্যবান থতমত খেয়ে যান।—'না, মানে এতগুলো মেয়ের জীবন এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওরা আমাদের ওপর নির্ভর করে। চোখ বুজে তো থাকা যায় না।'

পরমেশ রীতিমতো গম্ভীর হয়ে যান। হালকা ভাবটা আর নেই। বললেন, 'আমি মজা করছিলাম সত্যবানদা। ইট'স আ ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার। আপনি যা ভাবছেন, আমার ধারণা, সেটাই ঠিক। ওই মেয়েমানুষটা, আই মিন মমতা, খুবই গোলমেলে টাইপের। গ্রামে মাল বেচতে এসে গায়ে পড়ে পরোপকারের বাসনা চাগাড় দিয়ে উঠল, এমন মহীয়সী মহিলা আমাদের এই প্ল্যানেটে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ। আমি বলি কি, পাত্রদের কলকাতার যে ঠিকানাগুলো দিয়েছে, সেসব জায়গায় ভাল করে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। তা হলেই মেয়েমানুষটির মতলব, যদি কিছু থেকে থাকে, ধরা পড়ে যাবে।'

সত্যবান বললেন, 'এগ্‌জাক্টলি। খোঁজ নিতে গেলে আমাদের ওই সব অ্যাড্রেসে যেতে হবে। কারও একার পক্ষে এতগুলো এলাকায় যাওয়া সম্ভব নয়।'

ঠিক হল, রাজানগর থেকে নানা কাজে যাদের কলকাতায় যেতে হয় তাদের ঠিকানাগুলো ভাগ করে দেওয়া হবে। চোদ্দজনকে একটা করে অ্যাড্রেস দিলে কারও ওপর তেমন চাপ পড়বে না। কাজটাও মসৃণভাবে, কম সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে। কাকে কাকে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তাও স্থির করা হল।

সত্যবান নিজে চম্পার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা তাদের বাড়ি যাবেন। ছেলেটির নাম অনিল জানা। বাবার নাম ষষ্ঠীপদ জানা। তাদের ঠিকানা কালীঘাটে। বললেন, 'পরশু বাজারে হাজারি বুড়ির সঙ্গে দেখা হবে। কালই আমি কালীঘাটে গিয়ে সব জেনে আসব। মমতা অনিল সম্পর্কে যা বলেছে তা যদি ঠিক হয়, কোনও প্রবলেম নেই। কিন্তু অন্যরকম হলে কড়া স্টেপ নিতে হবে।'

এগারো

পরদিন দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন সত্যবান।

কিছুদিন হল রাজানগর থেকে এসপ্ল্যানেড অব্দি মিনিবাসের একটা রুট চালু হয়েছে। আগে বার দুই বাস কি মিনি পালটে কলকাতায় যেতে হতো। এখন অনেক সুবিধা। রাজানগর বাস টারমিনাস থেকে বাস বা মিনিতে চাপলে আর গাড়ি টাড়ি বদল করার হাঙ্গামা নেই, সোজা কলকাতার হৃৎপিণ্ডে পৌঁছনো যায়।

সত্যবান এসপ্ল্যানেডে এসে মেট্রো রেল ধরলেন। বারো মিনিটে পৌঁছে গেলেন কালীঘাটে। ষষ্ঠীপদ জানাদের যে ঠিকানা মমতা লিখে দিয়েছিল তা হল ১২ডি মহেশ হালদার রোড। সেটা কালীঘাট মন্দিরের কাছাকাছি, গলির গলি, তস্য গলি।

ঠিকানাটায় গলদ নেই। ১২ডি বাড়িটি আদ্যিকালের একটা দোতলা। পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। ভিত থেকে ছাদ অব্দি নোনা-ধরা। রেন ওয়াটার পাইপগুলোর সামান্য কিছুই টিকে আছে। কার্নিস ভাঙাচোরা, দরজা-জানালার বেশির ভাগ পাল্লাই নেই; টিন ফিন লাগিয়ে কোনও রকমে কাজ চালানো হয়। কর্পোরেশন কেন যে এরকম একটা বাড়ি ভেঙে ফেলার নোটিশ ধরায়নি সেটাই আশ্চর্য।

হাজারি বুড়ির মমতাদিদি তাকে জানিয়েছিল অনিল দিল্লিতে চাকরি করে। অনেক টাকা মাইনে। যে প্রচুর রোজগার করে তার বাড়ির হাল এমন হবে কেন?

প্রথমেই একটা ধাক্কা খেলেন সত্যবান। কপালে ভাঁজ পড়তে লাগল। কয়েক লহমা বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। তারপর বন্ধ সদর দরজার কড়া নাড়লেন।

কিছুক্ষণ পর একজন ক্ষয়াটে চেহারার মাঝবয়সী লোক দরজা খুলে মিলিটারি টাইপের পোশাক-পরা, লম্বা-চওড়া, জবরদস্ত সত্যবানকে দেখে হকচকিয়ে গেল।

মধ্যবয়সীর ধুতি পরার ধরন দেখে টের পাওয়া গিয়েছিল, লোকটা অবাঙালি। খুব সম্ভব বিহার বা উত্তরপ্রদেশের আদি বাসিন্দা। হাতজোড় করে বিনীতভাবে বলল, 'নমস্তে বাবুসাহেব—'

প্রতি-নমস্কার জানালেন সত্যবান। জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কী নাম?'

'রঘুনন্দন মিশির।' বলে ভয়ে ভয়ে সে জানতে চাইল, 'বাবুসাহেব আপনি কি কিসিকো ঢুঁড়ছেন?' হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলছে লোকটা।

সত্যবান সরাসরি প্রশ্নটার উত্তর দিলেন না। বললেন, 'এই বাড়িটায় কারা থাকে?'

'আমি, আমার ঘরবালি, এক বেটি. দুই বেটা, এক পুতহু (পুত্রবধূ)।'

'আর কেউ থাকে না?'

'নেহি।'

'কতদিন আপনারা এখানে আছেন?'

'হোবে লগভগ তিশ-বত্তিশ সাল।'

'কী করেন আপনি?'

'আমাদের দু'টো ছোটামোটা দুকান আছে। একটা জামাকাপড়ের, আমি ওটা সামলাই। আর একটা হল ইস্টিলের বাসনের। দুই বেটা সেটা দেখে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর আসল প্রসঙ্গে চলে এলেন সত্যবান। 'আপনারা ছাড়া এখানে আর কেউ থাকে না?'

রঘুনন্দন ভীষণ অবাক হয়ে যায়। বলে, 'নেহি বাবুসাহেব।'

বাইরে থেকে দেখে লোকটাকে সরল, অকপট মনে হয়। কিন্তু মুখে সব কিছু লেখা থাকে না। ধূর্ত, ধড়িবাজদের পেটে অনেক রকম ছলচাতুরি লুকানো থাকে। জীবনে কত ধরনের মানুষই না দেখেছেন সত্যবান! ভাল, মন্দ, চতুর, ফেরেববাজ, সৎ, বজ্জাত। মনে হচ্ছে না, রঘুনন্দনের মধ্যে কোনও ঘোরপ্যাঁচ আছে। তবু সোজাসুজি তার চোখের দিকে তাকিয়ে, চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'আপনি ঠিক বলছেন?'

'জরুর। আপনাকে ঝুট বলে আমার কী লাভ?'

লোকটা বিনয়ী হলেও তার কণ্ঠস্বরে বেশ দৃঢ়তা আছে। মনে হল, সে মিথ্যে বলছে না। কিন্তু রাজানগর থেকে এতদূর এসে মনে সামান্য খিঁচ রেখেও তিনি ফিরে যাবেন না। বললেন, 'অনিল জানা, তার বাবা ষষ্ঠীপদ জানা আর তাদের ফ্যামিলি এখানে থাকে না বলছেন?'

রঘুনন্দন জানায়, এমন সব নাম জীবনে সে এই প্রথম শুনল। বাবুসাহেব যদি অবিশ্বাস করেন, কৃপা করে বাড়ির ভেতরে এসে দেখে যান। সসম্ভ্রমে সে বলতে লাগল, 'আইয়ে—আইয়ে—'

যে এত জোর দিয়ে তার বাড়ির অন্দরমহলে যেতে বলে তাকে অবিশ্বাস করার মানে হয় না। সত্যবান বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার কথা মেনে

নিলাম। আপনি তো বললেন ত্রিশ-বত্রিশ বছর এখানে আছেন। এই গলির অন্য কোনও বাড়িতে অনিল আর ষষ্ঠীপদ থাকতে পারে?'

'নেহি—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে রঘুনন্দন, 'আমাদের গলি তো বটেই, আশপাশের গলিতেও যত আদমি রয়েছে তাদের সবাইকে আমি চিনি। না বাবুসাহেব, ষষ্ঠীপদ আর অনিল বলে কেউ এই ইলাকায় থাকে না।'

অর্থাৎ মমতা নির্ভুল ঠিকানা দিয়েছে, কিন্তু মানুষগুলো ভুয়ো। কালীঘাটের এই ঠিকানা কিভাবে সে জোগাড় করল, কে জানে। ধড়িবাজ মেয়েমানুষ, হয়তো কখনও এখানে এসেছিল, বাড়ির নম্বরটা মনে করে রেখেছে।

অনিল আর ষষ্ঠীপদর অস্তিত্বই যেখানে নেই সেরকম একটা ঠিকানা হাজারি বুড়িকে মমতা দিল কী করে? সত্যবান রীতিমতো ধন্দে পড়ে যান। মেয়েমানুষটার সত্যিই বুকের পাটা আছে। কিংবা এমনও হতে পারে, সে ভেবে নিয়েছে ঠিকানা পেলেই হাজারি খুশি হবে। তার প্রতি বুড়ির আস্থা শতগুণ বেড়ে যাবে। সুদূর গোপীগঞ্জ থেকে এই ঠিকানায় ওই লোক দু'টো আদৌ থাকে কিনা, তার খোঁজখবর নিতে আসবে না। বুড়ো মানুষ। না আছে জনবল, না অর্থবল। লোক পাঠিয়ে যাচাই করে নেবে তেমন সম্ভাবনাই নেই।

রঘুনন্দন সত্যবানের দিকে তাকিয়ে ছিল। পলকহীন। কী ভেবে বলে ওঠে, 'বাবুসাহেব যদি বুরা (খারাপ) না মনে করেন, এক বাত পুছব?'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন সত্যবান। একটু চমকে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'অনিল আর ষষ্ঠী এই কোঠিতে থাকে, এ খবরটা কে আপনাকে দিয়েছে?'

হাজারি বুড়ির নামটা করলেন না সত্যবান। বললেন, 'মমতা বলে একটি মেয়েলোক।'

এই নামটায় কাজ হল। রঘুনন্দন তাকে চিনতে পারে। বলে, 'হাঁ, হাঁ, মম্‌তা ইখানে হরেক কিসিমের সামান বেচতে আসে। গোরা গোরা (ফর্সা) রং, উমর হোবে চাল্লিশ। বাতচিত বহুৎ মিঠা।' সে আরও জানায় মমতা খুবই মিশুকে, উপকারী। বিশেষ করে পাড়ার জোনানা মহলে সে খুবই জনপ্রিয়। কারও বাড়িতে বিয়ের যোগ্য মেয়েটেয়ে থাকলে, মমতা যেচে বলে, তাদের জন্য উপযুক্ত পাত্র জোগাড় করে দেবে। সে এই অঞ্চলে এলে নানা বাড়ির গিন্নিবান্নিরা তাকে ছেঁকে ধরে।

ধড়িবাজ মেয়েমানুষটির চতুর চালটা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায় সত্যবানের কাছে। শুধু গ্রামগুলোতেই নয়, কলকাতাতেও সে মাকড়সার মতো জাল বিছিয়েছে। বললেন, 'আচ্ছা চলি—'

সত্যবান যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন, রঘুনন্দন কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়ে বলে, 'বাবুসাহেব আপনি যে অনিল আর ষষ্ঠীর খোঁজ নিতে এসেছেন, এর মধ্যে কুছু গোলমাল আছে?'

'আমার তাই মনে হয়।' বলতে বলতে চকিতে কী যেন খেয়াল হয় সত্যবানের। —'বিয়ের বয়েস হয়েছে, এমন কোনও মেয়ে কি আপনার আছে?'

'আছে বাবুসাহেব।' রঘুনন্দন বলে, 'মমতা তার শাদির জন্যে একটা আচ্ছা লেড়কা জোগাড় করে দেবে বলেছে। লেকিন—' বাকিটা শেষ না করে সে থেমে যায়।

বোঝাই যাচ্ছে, লোকটার মনে খটকা দেখা দিয়েছে। তার কাঁধে একটা হাত রেখে সত্যবান বললেন, 'রঘুনন্দনজি, ওই মেয়েমানুষটা ভাল নয়। ও যে পাত্রের কথা বলেছে তার হাতে মেয়ে দেবেন না।'

সত্যবান আর দাঁড়ালেন না। লম্বা লম্বা পা ফেলে গলির নানা বাঁক ঘুরে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে রঘুনন্দনের ভাবনাটা মাথায় পাক খেতে থাকে। তার এবং হাজারি বুড়ির মতো সরল, সাদাসাপটা মানুষদের টারগেট করে মমতা আর তার দলবল কাজ হাসিল করে নেয়।

কলকাতা থেকে রাজানগরে ফিরে নিজের বেড়রুমে তাঁর প্রিয় ইজিচেয়ারটিতে শরীর এলিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলেন সত্যবান। মিনিবাস আর মেট্রোয় কলকাতায় যাওয়া-আসা, কালীঘাটের বাহান্ন পাকের গলিতে ঘুরতে ঘুরতে রঘুনন্দনকে খুঁজে বার করা, তার সঙ্গে কথাবার্তা, সমস্ত মিলিয়ে বিরাট এক অভিযান। রীতিমতো ক্লান্তি বোধ করছিলেন তিনি। এক সময় এসব ছিল জলভাত। কয়েক বছর আগেও এর চেয়ে দূরে দূরে গেলেও এনার্জি অটুট থাকত। ফিরে আসার পর মনে হতো, বেরুবার সময় যেমনটি ছিলেন, ফেরার পর অবিকল তেমনই তরতাজা আছেন। কিন্তু ইদানীং টের পাচ্ছেন, বয়স হয়েছে। ক্ষয় ধরেছে শরীরে।

বেলা পড়ে এসেছে। হাতমুখ ধুয়ে বাইরের পোশাক পালটে নিলেন সত্যবান। শরীরে যে অবসাদ জমেছিল তা কেটে গেছে।

লক্ষ্মী নজর রাখছিল। সত্যবানের পোশাক-টোশাক পালটানো হওয়া মাত্র বিকেলের খাবার আর চা নিয়ে এল। একেক দিন একেক রকম খাবার করে সে। মুখরোচক এবং পুষ্টিকর। কোনও দিন লুচি তরকারি, কোনও দিন পরোটা আলুর দম, কোনও দিন ঘুগনি, মোচার চপ। আজ করেছে চিঁড়ের পোলাও।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে নিচে নেমে 'সুরক্ষা'য় চলে এলেন সত্যবান। দুপুরে কলকাতায় গিয়েছিলেন, তাই ওবেলা অফিস খোলা হয়নি।

শীত পড়তে এখনও কিছুদিন বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই বেলা ছোট হয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে গেল।

একে একে 'সুরক্ষা'র মেম্বাররা হাজির হতে লাগল। অফিস যখন জমজমাট তখন রঘুনন্দনের কাহিনি সবিস্তার জানিয়ে দিলেন সত্যবান।

মমতা আরও যেসব পাত্রদের নামধাম লিখে দিয়েছিল, 'সুরক্ষা'র অন্য ক'জন মেম্বারকে তাদের খোঁজটোঁজ নেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একদিনের মধ্যে সবার পক্ষে কলকাতায় গিয়ে ইনফরমেশন জোগাড় করা সম্ভব হয়নি। তবে সত্যবানের মতো পরমেশ ধর এবং রজতের প্রচণ্ড উৎসাহ। তারা দুই ঠিকানায় আজই হাজির হয়েছিল। হুবহু সত্যবানের মতোই অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের। ঠিকানাগুলো সঠিক, লোকগুলো ভুয়ো। যাদের সন্ধানে যাওয়া তারা কেউ ওই দুই জায়গায় থাকে না।

তিনজনের বিবরণ শোনার পর 'সুরাক্ষা'য় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি সদস্য জানান, যেভাবেই হোক, চম্পা এবং তাদের এলাকার অন্য মেয়েগুলোর বিয়ে আটকাতেই হবে।

পরের দিনটা শুক্রবার।

তাঁর নিয়ম অনুযায়ী বাজারে এলেন সত্যবান। অন্য কিছু কেনাকাটার আগে তিনি প্রথমে হাজারি বুড়ি আর চম্পার কাছে গেলেন।

সত্যবান যেদিন বাজারে আসেন, তাঁর সঙ্গে কেউ না কেউ থাকে। আজ তপুর কলেজের ফাউন্ডেশন ডে, তাই ছুটি। তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিনি। তপুর হাতে রয়েছে দু'টো চটের ব্যাগ, তাঁর হাতে একটা।

অন্য সব দিন যেমনটা করে, সত্যবানের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে তেমনি আজও ফলটল ভরতে যাচ্ছিল হাজারি বুড়ি, তাকে থামিয়ে দিয়ে সত্যবান বললেন, 'ওসব পরে হবে। আমার সঙ্গে ওপাশে চল—'

হাজারি অবাক হল। কখনও এভাবে যেতে বলেন না সত্যবান। কোনও প্রশ্ন না করে চম্পাকে খদ্দের সামলানোর দায়িত্ব দিয়ে সে এগিয়ে এল।

সত্যবান তপুকে দাঁড়াতে বলে হাজারিকে সঙ্গে করে খানিকটা দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এলেন। বললেন, 'অনিল জানার সঙ্গে নাতনির বিয়ের আশা ছাড়।'

হাজারি বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থাকে। সত্যবানের কথাগুলো তার মাথায় যেন ঢুকছে না।

সত্যবান বললেন, 'আমার কাছে চম্পার বিয়ের কথা না বললে মহা বিপদ হয়ে যেত।'

'কী হয়েছে বড়বাবা, আমি তো কিচুই বুজতি পারচি না।'

'তোমার ওই মমতাদিদি মনে হচ্ছে ভীষণ পাজি মেয়েমানুষ।'

হাজারি চমকে ওঠে। 'এ কথা বুলচেন কেন বাবা?'

সত্যবান জানালেন, মমতা চম্পার জন্য যে পাত্রের ঠিকানা টিকানা দিয়েছিল, তিনি নিজে কাল সেখানে খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলেন। পাত্র অনিল জানা আর তার বাবা ষষ্ঠী জানা বলে কেউ ওই ঠিকানায় থাকে না। কস্মিনকালে থাকতও না।

হাজারি বুড়ি দম-আটকানো গলায় বলে, 'সি কী!'

সত্যবান বলতে লাগলেন, 'অনিল নামটা খুব সম্ভব বানানো। ওই নাম করে তোমাদের মমতাদিদি হয়তো অন্য কারও সঙ্গে চম্পার বিয়ে দিতে চায়। দিনকাল বড্ড খারাপ। যেমন তেমন করে একটা বিয়ে দিয়ে চম্পাকে কোথায় কার কাছে বেচে দেবে তার কি কিছু ঠিক আছে? কাগজে এমন খবর প্রায় রোজই বেরুচ্ছে। নাতনির ভাল চাইলে এই বিয়ে ভেঙে দাও। মমতা এলে তাকে ভাগিয়ে দেবে।'

মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল হাজারি বুড়ির। একদিকে স্বপ্নভঙ্গ, আরেক দিকে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা। কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি আমাগের আপনার নোক। ঝ্যাখন বুলচেন, লিচ্চয় বে' ভেঙি দুবো। মেইয়েছেলেটার প্যাটে যে অ্যাত শয়তানি বুজতি পারিনি। ভাগ্যিস আপনারে বুলেছিনু, ভগমান আমাগেরে বাঁচায়ে দেছে।'

হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, এভাবে সত্যবান বললেন, 'ও ভাল কথা, চম্পা ছাড়াও আরও ক'টা মেয়ের পাত্রদের ঠিকানা দিয়েছিলে। আমার দুই বন্ধু দু'জায়গায় গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে, লোকগুলো ভুয়ো। ওসব জায়গায় তারা থাকে না।'

মুখটা একেবারে চুপসে যায় হাজারির। 'বলেন কী বাবা!' তার গলার স্বর বুজে আসে।

সত্যবান বললেন, 'ওই মেয়েগুলোর মা-বাপদের বলে দিও. এই বিয়ের ব্যাপারে আর যেন না এগোয়। মমতাকে তোমাদের গ্রামগুলোতে ঢুকতে দিও না।'

আস্তে ঘাড় কাত করে হাজারি।

'চল এবার—'

দু'জনে হাজারির ফলের দোকানের দিকে এগিয়ে যায়।

বারো

দিনকয়েক পর একদিন সন্ধেবেলায় 'সুরক্ষা'র অফিসে হালকা মেজাজে সত্যবানরা গল্প করছিলেন। দু'তিনটে বড় রকমের ঝঞ্ঝাট সুচারুভাবে সামলানো গেছে। রিনি আর রজতের বিয়েটা কয়েক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। ওদের দুই বাবা যে শতবর্ষের যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল তার অবসান ঘটেছে। শোনা যাচ্ছে, বিনায়ক একদিন মনোতোষদের বাড়ি গিয়েছিল। মনোতোষও বিনায়কের বাড়ি গিয়ে প্রচুর মিষ্টি খেয়ে, প্রচুর আড্ডা দিয়ে এসেছে।

ওদিকে চম্পা ও গোপীগঞ্জ এলাকার চোদ্দটি মেয়ের বিয়ে আটকানো গেছে। সনেকপুরের জলাটা বোজানোর চক্রান্তও বানচাল করা হয়েছে।

এই সব কারণে 'সুরক্ষা'র মেম্বারদের বেশ খুশি খুশি ভাব।

আচমকা তাল কেটে গেল।

দরজার বাইরে থেকে কার গলা ভেসে এল, 'বড়সায়েব, বড়সায়েব—'

সবাই খোশ গল্পে মেতে ছিল। চমকে দরজার দিকে তাকায়। সেখানে সনেকপুরের হাফেজ আলি, জন নিরাপদ বিশ্বাস, গোবিন্দ মণ্ডল, শিবু নস্কর, এমনি কয়েক জন দাঁড়িয়ে আছে।

এই সন্ধেবেলায় সনেকপুর থেকে হাফেজ আলিরা দল বেঁধে এখানে হাজির হবে, ভাবা যায়নি। কয়েক লহমা সকলে তাকিয়ে থাকে।

বিস্ময়টা প্রথমে সত্যবানই কাটিয়ে ওঠেন, 'নিরাপদ, হাফেজ, শিবু—দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এস।'

হাফেজ আলিরা অফিসে ঢুকে মেঝেতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পড়ে। লক্ষ করা গেল, তাদের চোখে মুখে প্রবল উদ্বেগ।

'সুরক্ষা'র মেম্বাররা সবাই অবাক। সত্যবান জিজ্ঞেস করেন, 'হঠাৎ এ সময় তোমরা এলে! কোনও দরকার আছে?'

হাফেজ নিচু গলায় ভয়ে ভয়ে বলে, 'দিনির (দিনের) বেলা আসতি সাহস হয় নে। তাই আঁধার নামলি নুকিয়ে নুকিয়ে আলাম (এলাম)।'

সত্যবানের কপালে ভাঁজ পড়ে।—'দিনের বেলা আসতে সাহস না হওয়ার কারণটা কী?'

'ঝদিন (যদি) ওদের লজরে পইড়ে যাই—'

'কাদের কথা বলছ?'

'সিদিন ঝাদিগির (যাদের) কথা আপনারে বুলেছিনু সেই গাল-কাটা গাব্বা আর তার দলের খুনেগুনো। ঝদিন ওরা টের পায় আমরা আপনাগের হেথায় নালিশ করতি এসিচি, তিষ্ঠুতে দেবে নি। জেবন বরবাদ করে দেবে। ছেলেমেইয়ে নে (নিয়ে) ঘর করি। জানডা চইলে গ্যালে—'

হাফেজের সঙ্গী নিরাপদ গোবিন্দ শিবুরাও একই কথা বলতে লাগল।

সত্যবান এবং 'সুরক্ষা'র অন্য সব মেম্বারের শিরদাঁড়া টান টান হয়ে যায়। সত্যবান জানতে চান, 'হঠাৎ ওদের ভয় পাওয়ার মতো কী হল?'

নিরাপদ যা জানায় তা এইরকম। কিছুদিন আগে সত্যবান সেই যে সনেকপুরে গিয়েছিলেন, তারপর ওখানকার জলা বোজানো কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। কিন্তু পরশুর আগের দিন থেকে গাল-কাটা গাব্বারা ফের তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

আগে দিনের বেলা, সবার চোখের সামনে গাব্বা আর দলবল ইটপাথর ঘেঁষ এবং নানা ধবনের রাবিশ এনে ফেলছিল। ইদানীং তেমনটা করছে না। অনেক রাত্তিরে চারদিক নিশুতি হয়ে গেলে লরিতে বস্তা বোঝাই করে রাবিশ-টাবিশ নিয়ে ওরা আসে। লরিটা দূরে দাঁড় করিয়ে ঘাড়ে করে বস্তাগুলো এনে চুপিসারে, খুব আস্তে আস্তে জলে নামিয়ে দেয়। এলাকার লোকজন তখন ঘুমের আরকে ডুবে থাকে। কারও টের পাওয়ার কথা নয়। এই সুযোগে কাজটা হাসিল করে নিতে চাইছে।

কিন্তু পরশু রাত্তিরে, তখন দু'টো-আড়াইটা বেজে গেছে, নিরাপদর বাইরে বেরুবার দরকার হয়েছিল। চোখে রাজ্যের ঘুম। আকাশে মরা চাঁদের একটা ফালি ছিল। আবছা আলো-আঁধারে প্রথমটা মনে হয়েছিল, অনেকগুলো ছায়ামূর্তি জলার ওধারে কী যেন বয়ে বয়ে এনে নিঃশব্দে জলে নামিয়ে দিচ্ছে।

দেখার ভুল কী? কয়েক লহমা তাকিয়ে থাকতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। দু'একজনকে চিনেও ফেলেছিল নিরাপদ। তারা গাব্বার গ্যাংয়ের বন্দুকবাজ।

বুক কেঁপে উঠেছে নিরাপদর। সে পা টিপে টিপে হাফেজ শিবু গোবিন্দদের ডেকে এনে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখিয়েছিল। শুধু সেদিনই নয়, তারপর আরও দু'রাত তারা গাব্বাদের জলা বোজানো লক্ষ করেছে।

সত্যবান তাদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে এসেছিলেন, দূর থেকেই যেন গাব্বাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখে। কোনও রকম বাধা দেবার চেষ্টা না করে। অবশ্য তেমন বুকের পাটা তাদের নেই। সত্যবান আরও বলেছিলেন,

জলা বোজানো দেখলেই তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। তাই আজ ওরা চলে এসেছে।

সমস্ত শোনার পর ঘরের ভেতর স্তব্ধতা নেমে আসে। খানিক আগে জলা বোজানো নিয়ে 'সুরক্ষা'র মেম্বারদের কথাবার্তায় বেশ একটা গর্ব গর্ব ভাব ফুটে বেরুচ্ছিল। সত্যবানরা ধরেই নিয়েছিলেন পরিবেশ রক্ষায় এটা তাঁদের একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু এখন টের পাওয়া যাচ্ছে গাব্বারা কী ধরনের ধুরন্ধর। কোনও ঝঞ্ঝাট না বাধিয়ে কাজটা হাসিল করতে চায়। ঠিক গাব্বারা হয়তো নয়, তাদের যারা কাজে লাগিয়েছে এটা তাদের একটা চতুর চাল। সত্যবানরা সেদিন সনেকপুরে যাবার পর অদৃশ্য খেলোয়াড়রা অনেক সতর্ক হয়ে গেছে। কৌশলে যদি স্বার্থ সিদ্ধি হয় তখন গুলি বন্দুকের ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কী লাভ?

হাফেজ উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, 'একন আমাগেরে কী করতি বলেন?'

সত্যবান বললেন, 'সেদিনও তোমাদের যা বলে এসেছিলাম, এখনও তাই বলছি। নিজেরা কিচ্ছু করবে না। শুধু দেখে যাবে। রাত্তির হল। এখন বাড়ি ফিরে যাও। সব শুনলাম। দেখি আমরা কী কবতে পারি।'

হাফেজরা চলে গেলে সত্যবান উঠে পড়েন। তাঁর মুখ কঠোর হয়ে উঠে, হাত দু'টো বার বার মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে। 'সুরক্ষা'র অন্য মেম্বারদের মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের চোয়ালও শক্ত হয়ে উঠেছে।

পরমেশ ধর বললেন, 'এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

নিশানাথ ভট্টাচার্য বললেন, 'মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্যামাদাসবাবু সেদিন কথা দিয়েছিলেন, সনেকপুরের জলাটা যেমন করে হোক, রক্ষা করবেন। কিন্তু এটা হচ্ছে কী?'

সবাই নানারকম মন্তব্য করছে। সত্যবান একটি কথাও বললেন না। অস্থির পায়ে কামরার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অব্দি হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন।

বোঝাই যায়, মাথার ভেতর কোনও চিন্তা ঝড় তুলেছে। একসময় হাঁটা থামিয়ে নিজের চেয়ারটিতে এসে বসে পড়লেন। টেবলের একধারে একটা বড় ডায়েরিতে অগুনতি ফোন নাম্বার লেখা আছে। হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, গন্ডা গন্ডা সরকারি দপ্তর থেকে শুরু করে বিশিষ্ট মানুষজনের নাম্বার। ডায়েরি খুলে ক্ষিপ্র আঙুলে পাতা উলটে উলটে শ্যামাদাস চক্রবর্তীর বাড়ির এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে তাঁর কামরার ডাইরেক্ট লাইনের নাম্বার দু'টো বার করে ফেললেন।

সন্ধের পরও অনেক সময় জরুরি কোনও মিটিং টিটিং থাকলে শ্যামাদাস মিউনিসিপ্যালিটি বিল্ডিংয়ে থেকে যান। সত্যবান ঠিক করলেন, আগে সেখানে ফোন করবেন, না পাওয়া গেলে বাড়িতে।

শ্যামাদাসকে তাঁর অফিসেই পাওয়া গেল। মধ্যরাতে যে সনেকপুরের জলাটা ফের বোজানো শুরু হয়েছে এবং এই দুষ্কর্মটি করছে গাল-কাটা গাব্বারা, সব জানিয়ে সত্যবান বেশ কড়া গলাতেই বললেন, 'আপনি কিন্তু কথা দিয়েছিলেন ওয়েটল্যান্ডটা বোজাতে দেবেন না। ওটা প্রিজার্ভ করা হবে, যা রাবিশ টাবিশ ফেলা হয়েছিল, তুলে ফেলে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু তার ঠিক উলটোটাই হচ্ছে। কয়েক দিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার পর গাব্বারা আবার যে অ্যাকটিভ হয়ে উঠেছে, এর মানে কী?'

'আপনার কথা শুনে অদ্ভুত লাগছে।' যেন আকাশ থেকে পড়েছেন, এমন একটা ভাব করে শ্যামাদাস বলতে লাগলেন, 'এটা তো হবার কথা নয়। আপনারা সেদিন এসে কমপ্লেন করার পরই মিউনিসিপ্যালিটির দু'জন অফিসারকে সনেকপুরে পাঠিয়েছিলাম। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, আমি ঠিক বলছি কিনা—'

'খোজ নিয়েছি। আপনি ঠিকই বলছেন। অফিসাররা গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে এসেছেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আপনারা কিন্তু কোনও স্টেপই নেন নি।'

শ্যামাদাস বললেন, 'রাত্তিরে যাবা এসে জলা বোজায় তাদের বিরুদ্ধে কী স্টেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে আমরা ভাবব। এ ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসারদের নিয়ে একটা মিটিংও করা হবে। আপনাকে সেদিনই বলেছিলাম, আমাদের এত লোকজন নেই যে প্রতিটা জলাজমি সারাক্ষণ পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে পারি।'

'তার মানে এটাই কি ধরে নিতে হবে, আপনারা কিছুই করতে পারবেন না?'

শ্যামাদাস হাঁ হাঁ করে ওঠেন, 'না না, তা কেন? আমরা ঠিক করেছি, পুলিশের সঙ্গে খুব শিগ্গির কনট্যাক্ট করব। তাদের ওই ওয়েটল্যান্ডটার ওপর নজর রাখতে বলব। পুলিশ কেসটা টেক আপ করলে কাজ হবে।'

সত্যবান বুঝতে পারছেন, নিজেদের ঘাড় থেকে দায়িত্ব নামাবার এটা একটা সচতুর কৌশল শ্যামাদাসের। যে কাজ মিউনিসিপ্যালিটির সেটা পুলিশের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। একটু ভেবে তিনি বললেন, 'একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করে দিয়েছে।'

'কী ব্যাপার?'

'আপনার অফিসাররা সনেকপুরে গিয়েছিলেন, তা নিশ্চয়ই গাব্বারা জানতে পেরেছে। নইলে মাঝখানে জলা বোজানো বন্ধ করত না। সব জেনেও ওদের এত সাহস হয় কী করে?'

'সেটা আমারও মাথায় ঢুকছে না।' শ্যামাদাসের গলা শুনে মনে হল, সরল দেবশিশু কথা বলছে।

কণ্ঠস্বর উঁচুতে তুলে সত্যবান বললেন, 'আমার মাথায় কিন্তু ঢুকে গেছে। ওই ক্রিমিনালটার পেছনে কোনও পাওয়ারফুল রাজনৈতিক নেতার মদত আছে। নইলে যত বড় বন্দুকবাজই হোক, এত বড় বুকের পাটা তার হত না।'

শ্যামাদাস উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ একেবারে চুপচাপ। তারপর সত্যবান জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি লাইনে আছেন?'

শ্যামাদাসের গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, আছি। আপনার কথাগুলো মনে মনে ভেবে দেখছিলাম।'

সত্যবান বলেন, 'আমার কী মনে হয় জানেন? মিউনিসিপ্যালিটির দু'চারজন অফিসার পাঠিয়ে জলা বোজানো ঠেকানো যাবে না। গাব্বাদের পেছনে যে পলিটিক্যাল নেতাটি রয়েছে তাকে খুঁজে বার করে পিপলের কাছে এক্সপোজ না করতে পারলে ওয়াটার বডিটা রক্ষা করা অসম্ভব।'

শ্যামাদাস বললেন, 'সেদিনও আপনাকে বলেছি, আজও বলছি, গাব্বা বলে কোনও অ্যান্টি-সোশালকে আমি চিনি না। তার পেছনে কোনও পলিটিক্যাল পার্টির লিডার রয়েছে বা থাকতে পারে, সে ব্যাপারে আমার তিলমাত্র ধারণা নেই। যাই হোক, আপনি নতুন করে সনেকপুরের জলাটা নিয়ে কমপ্লেন করলেন। ওটা আমি দেখছি—'

'দেখুন—' নীরস গলায় সত্যবান বললেন, 'গাব্বার পলিটিক্যাল কানেকশনটা চুরমার করে দিতে না পারলে বেশি কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কিছুদিন আপনাদের জন্যে ওয়েট করব। যদি কিছু না করেন, ওটা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের 'সুরক্ষা'কেই নিতে হবে।'

'কী করতে চান আপনারা?'

গলা শুনে মনে হল, শ্যামাদাস বিব্রত তো হয়েছেনই, খানিকটা ঘাবড়েও গেছেন। সত্যবান বললেন, 'এখনও সেটা ঠিক করি নি, তবে কিছু একটা করতেই হবে।' বলে লাইনটা কেটে দিলেন।

'সুরক্ষা'র অন্য সদস্যরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিল। শ্যামাদাস কী বলেছেন, শোনা যায়নি। তবে সত্যবানের কথা থেকে সবাই আন্দাজ করে নিয়েছে।

এরপর জলাভূমি বাঁচানো এবং গাব্বার মদতদাতা জননেতাটিকে কিভাবে খুঁজে বার করা যায় তা নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলল। আপাতত স্থির হল, জলাটাকে বাঁচানোর জন্য দু'একদিনের মধ্যে 'সুরক্ষা'র মেম্বাররা রাত্তিরে পালা করে সনেকপুরে গিয়ে পাহারা দেবে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

তবে রাজনৈতিক নেতাটির সন্ধানের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা হবে না। চারদিকে খোঁজখবর নিয়ে এগুতে হবে।

অন্যদিন আটটায় 'সুরক্ষা'র অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজ নানা ঝকমারিতে সাড়ে আটটা বেজে গেল।

সবাই যখন উঠে পড়েছেন, সেই সময় হাজারি বুড়ি, চম্পা এবং মাঝবয়সী দু'টো অচেনা লোক হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। দেখেই বোঝা যায়, চম্পা আর হাজারির সঙ্গী দু'জন গেঁয়ো মানুষ। চুল উষ্কখুষ্ক, গালে কাঁচাপাকা খাপচা খাপচা দাড়ি। পরনে আধময়লা খাটো ধুতি আর জামা। তাদের সবার চোখেমুখে প্রবল আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা।

আজকের দিনটা বিস্ময়ে ঠাসা। একের পর এক চমকে হতবাক হয়ে যাচ্ছেন সত্যবানরা। প্রথমে এল হাফেজ আলিরা। তারপর হাজারি বুড়ির দঙ্গলটা। গোপীগঞ্জ এখান থেকে কম দূর নয়, বেশ কয়েক কিলোমিটার। এত রাতে হঠাৎ কেন এখানে হাজির হল, কে জানে। চেহারা দেখে ভাল ঠেকছে না। মনে হয় ওরা কোনও রকম সমস্যায় পড়েছে।

সত্যবান মুখ ফুটে কিছু বলে ওঠার আগেই হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল হাজারি বুড়ি। বলতে লাগল, 'আপনি না দেকলি আমরা মইরে যাব বাবা—'

আধবুড়ো লোকদু'টোও কাঁদো কাঁদো মুখে, হাতজোড় করে বলল, 'আমাগের বড় বেপদ বাবা। আমাগেরে বাঁচান।'

চম্পা কিছু বলছে না। তার মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ঠোঁট দু'টো থরথর করে কাঁপছে।

হাজারিকে পায়ের কাছ থেকে তুলে মেঝের একধারে বসিয়ে দিলেন সত্যবান। অন্যদেরও বসতে বললেন। সবাই বসলে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, এবার বল—'

হাজারি প্রথমে তার সঙ্গে যে অচেনা লোক দু'টো এসেছে তাদের পরিচয় দেয়। ওরাও গোপীগঞ্জের বাসিন্দা। নাম বলরাম আর হরিপদ। ওদের মেয়েদেরও বিয়ের বন্দোবস্ত করেছে মমতা নামে সেই মেয়ে মানুষটি।

চম্পা মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে। বাকি তিনজন বিশদভাবে যা জানায় তা এইরকম। মমতা ক'দিন আগে আরেক দফা বিয়ের কথাবার্তা বলতে এসেছিল। তার আগেই সত্যবানরা কলকাতায় গিয়ে তিনটি পাত্রের খবর নিয়ে এসেছেন এবং হাজারি বুড়িকে সাবধান করে দিয়েছেন, গোপীগঞ্জ আর তার আশপাশের কেউ যেন মমতার পাত্রদের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে না দেয়। সত্যবানের কথামতো হাজারিরা সবাই মমতাকে 'না' বলে দিয়েছিল। তাছাড়া শাসিয়েও দিয়েছে, ভবিষ্যতে মমতা যেন ওদিকের গাঁগুলোতে যাবার চেষ্টা না করে।

সেদিন ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট কিছুই করে নি মমতা। নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। হাজারিদের দুশ্চিন্তা তখনকার মতো কেটে গেছে। যাক, ভালয় ভালয় আপদ বিদায় হয়েছে। কিন্তু মমতাকে তখনও তাদের চিনতে অনেক বাকি ছিল। আজ দুপুরে ফের সে এসে হাজির। সঙ্গে ক'টা বন্দুকবাজ। এদের একজন গাল-কাটা গাব্বা। গাব্বাকে ওই এলাকার অনেকেই চেনে। তারা হুমকি দিয়ে গেছে, দশ দিন পর পাত্রদের নিয়ে গোপীগঞ্জে যাবে এবং সেদিনই মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে। যদি ঠেকাবার চেষ্টা করে, ফল হবে মারাত্মক।

শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন সত্যবানরা। গাব্বারা শুধু জলাই নয়, গ্রামের মেয়েদের দিকেও হাত বাড়িয়েছে। এ যে বিশাল এক লুটের বাজার। বন্দুকের জোরে ওয়েটল্যান্ড, খাল বিল, যুবতী মেয়ে—সব দখল করে বেচে দিতে চাইছে।

অসহ্য ক্রোধে মাথায় রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে সত্যবানের। দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'কোনও ভয় নেই। আমরা তোমাদের পাশে আছি। যা করার, দশ দিনের ভেতরেই করে ফেলব। অনেক রাত হল, এখন বাড়ি যাও।'

হাজারিরা কতখানি ভরসা পেল, তারাই জানে। ফ্যাকাসে মুখে কিছুক্ষণ সত্যবানের দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

তেরো

'সুরক্ষা'র অন্য মেম্বাররা একে একে চলে গেল। দরজায় তালা লাগিয়ে দোতলায় নিজের ঘরে চলে এলেন সত্যবান। রীতিমতো অন্যমনস্ক তিনি। খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

গাল-কাটা গাব্বাদের হাত থেকে চম্পার মতো মেয়েদের বাঁচাতে হলে এই অ্যান্টি-সোশালগুলেকে টিট করা দরকার। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব যদি তাদের গড-ফাদার রাজনৈতিক নেতাটিকে খুঁজে বার করা যায়। গাব্বা কোন পলিটিক্যাল পার্টির ছাতার তলায় শেলটার নিয়েছে তার হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। নিরাপদ কি হাফেজ আলিরা হয়তো জানে কিন্তু প্রাণের ভয়ে কেউ মুখ থেকে নামটা বার তো করছেই না, আভাসে ইঙ্গিতেও জানাচ্ছে না।

কখন যে খাটে উঠে বাজুতে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিলেন, খেয়াল নেই সত্যবানের। মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যাচ্ছে তাঁর। কোন পদ্ধতিতে এগুলে গাব্বার আসল খুঁটিটির সন্ধান পাওয়া যাবে, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ ফোন বেজে ওঠে।

চমকে, ধড়মড় করে নেমে পড়লেন সত্যবান। ক'পা এগিয়ে টেবল থেকে ফোনটা তুলতেই অন্য প্রান্ত থেকে বন্দনার গলা ভেসে এল। এমনিতে ব্রেকফাস্টের সময় এই মহিলাটি রোজ একবার ফোন করবেনই; এটা অনিবার্য নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু রাতের দিকে কখনও তো ফোন করেন না। হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে আজ সকালে একবার ফোন করার পর ফের এখন করলেন!

বন্দনার ফোন এলে সত্যবান ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যান। তিনি দুঃসাহসী ফৌজি অফিসার। কিন্তু বন্দনার গলা শুনলেই তাঁর বুকে কাঁপুনি ধরে যায়। কাণ্ডজ্ঞানহীন, বেপরোয়া এই মহিলাটির পক্ষে যা ইচ্ছা করা সম্ভব। লোকলজ্জার ধার ধারেন না, সঙ্কোচের বালাই নেই।

সত্যবান বললেন, 'কী ব্যাপার, এ সময় তো তুমি ফোন কর না—'

বন্দনা বললেন, 'করি না বলে যে কখনও করব না, এমন কথা কি তোমাকে দিয়েছি?'

'না, মানে—' সত্যবান থতিয়ে যান।

বন্দনা বললেন, 'একটা বিশেষ দরকারে তোমাকে এখন ফোন করছি।'

'এই রাত্তিরবেলা কী এমন দরকার পড়ল?'

'এত বড় বাড়িতে আমার একা একা ভীষণ ভয় করছে। তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও—'

ষাট হতে চলল বন্দনার। বলে কি মেয়েমানুষটা! কচি খুকির মতো ন্যাকা ন্যাকা গলায় বাহানা ধরেছে এই রাত্তিরবেলা আলিপুরে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে হবে! আবদারের একটা সীমা থাকা দরকার! যতটা সম্ভব মেজাজ শান্ত রেখে সত্যবান বললেন, 'একা থাকবে কেন? তোমার বাড়িতে গণ্ডা গণ্ডা কাজের লোক। ভয়টা কিসের?'

বন্দনা বললেন, 'চারজন ছুটি নিয়েছে। একতলায় কুকটা রয়েছে। দোতলায় আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার কথা একটু ভেবে দেখ—'

সত্যবান বললেন, 'দরজা জানালা ভাল করে বন্ধ করে শুয়ে থাকো।'

'এটা একটা কথা হল!' বন্দনা ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন, 'একজন মেয়ের পক্ষে এভাবে রাত কাটানো কি সম্ভব? তোমার মায়া দয়া নেই—'

সত্যবান উত্তর দিলেন না।

'ঠিক আছে, তুমি যখন আসতে চাইছ না, আমি না হয় চলে আসছি—'

সচকিত সত্যবান প্রায় চেঁচিয়েই ওঠেন, 'না, আসবে না। আমার মন টন ভাল নেই। হঠাৎ অনেকগুলো প্রবলেম দেখা দিয়েছে—'

তাঁকে শেষ করতে দিলেন না বন্দনা। —'এ সময় তোমার পাশে আমার থাকা দরকার। আমি গেলে তোমার প্রবলেমগুলো শেয়ার করে নিতে পারব। তোমার ওপর যে মেন্টাল প্রেসার চলছে তা অনেকটাই কমে যাবে।'

'নো—'

'কী নো?'

'তুমি আসবে না। এত রাতে হট করে অনাত্মীয় একটি পুরুষের কাছে এসে থাকলে লোকে কী বলবে, তা বুঝবার মতো বয়েস আশা করি তোমার হয়েছে।'

এত রূঢ়ভাবে আগে কখনও বন্দনাকে বলেন নি সত্যবান। যখনই বন্দনা ফোন করেন, কৌশলে তাঁকে তিনি এড়িয়ে যান। কিন্তু আজ এমনিতেই গাব্বাদের খবরটা হাজারি বুড়িদের কাছ থেকে পাওয়ার পর থেকে মেজাজ নিয়ন্ত্রণে নেই। তা ছাড়া কিছুদিন ধরে বন্দনা যেভাবে বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছেন তাঁর সামনে একটা দেওয়াল তুলে দেওয়া দরকার। শালীনতা শোভনতা বলে শব্দগুলো পৃথিবী থেকে এখনও একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে একবার ডান পাশের টেবলে চারুলতার হাস্যোজ্জ্বল ছবিটার দিকে তাকালেন সত্যবান। অন্য দিন বন্দনার সঙ্গে কথা বলার পর মহিলাটিকে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে মস্করা করেন। রগড়ের সুরে বলেন, তিনি জিতেন্দ্রিয় শুকদেবটিই রয়েছেন। কোনও সুন্দরী

নারী তাঁর চরিত্রে এখনও চিড় ধরাতে পারে নি। চারুলতা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আজ কিন্তু কিছুই বললেন না সত্যবান। শান্ত দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে ফের খাটে গিয়ে বসলেন।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে নিজের প্রিয় ইজি চেয়ারটাতে শরীর এলিয়ে দিলেন সত্যবান। অন্যদিন এই সময়টা ঘণ্টা দেড়-দুই বইটই পড়ে কাটান। তারপর ঘুমে যখন চোখ জুড়ে আসে তখন বিছানায় উঠে শুয়ে পড়েন।

কিন্তু আজ আর পড়তে ইচ্ছা করছে না। কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে। নানাদিক থেকে নানা চিন্তা হুড়মুড় করে মাথায় ঢুকে যাচ্ছে তাঁর। যে দু'টো সংকটের, অর্থাৎ জলা বাঁচানো এবং চম্পাদের বিয়ে ঠেকানোর চমৎকার সুরাহা হয়ে গেছে বলে ভাবা গিয়েছিল, সেগুলো বিরাট আকারে ফিরে এসেছে।

কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু সেটা কী? পার্টি যে ক্রিমিনালকে আশ্রয় দেয় তার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো রণকৌশল বা প্রক্রিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য সনেকপুরের জলায় রাতে পাহারার কথা তখন বলছিলেন ঠিকই, কিন্তু এ ব্যাপারে কার কতদিন উদ্যম থাকবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কেননা, 'সুরক্ষা'র মেম্বাররা নানাভাবে ব্যস্ত। কেউ কলেজ বা ইউনিভার্সিটির ছাত্র, কেউ অধ্যাপক, বেশির ভাগই চাকরি বাকরি করে। বেশ কয়েকজন আছেন যাঁদের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। এঁরা সবাই পুরোপুরি সুস্থও নন। অসুখবিসুখ লেগেই আছে।

সত্যবান ভেবেছিলেন চার-পাঁচজনের একেকটা গ্রুপ করে জলাটার পাহারার ব্যবস্থা করবেন। আজ একটা গ্রুপ নজরদারি করল তো কাল অন্য একটা গ্রুপ। যতই ভাগ ভাগ করে দিন, রাত জেগে স্বার্থহীন মহান ব্রত কতদিন তারা পালন করবে, সেটা এক বিরাট প্রশ্ন। তা ছাড়া, চম্পাদের বিয়ের ব্যাপারটাও রয়েছে। এই সমস্যাটা সবার আগে সামলানো দরকার। হাজারি বুড়িদের তিনি ভরসা দিয়েছেন গাব্বারা যাতে কোনও ঝঞ্ঝাট পাকাতে না পারে সে দিকটা তাঁরা দেখবেন। কিন্তু তা করতে হলে গোপীগঞ্জে 'সুরক্ষা'র কয়েকজনকে ঘাঁটি গেড়ে থাকতে হবে। কখন আচমকা ওই ক্রিমিনালগুলো হানা দেবে তার তো ঠিক নেই। কিন্তু লেখাপড়া, অফিস ইত্যাদি ফেলে কারাই বা সেখানে গিয়ে পড়ে থাকতে পারবে?

ইত্যাকার নানা চিন্তা যখন সত্যবানের মাথায় পাক খাচ্ছে, সেই সময় আচমকা টেলিফোন বেজে ওঠে। চোখে পড়ল, টেবল ক্লকে এগারোটা বেজে ছাব্বিশ। এই মধ্যরাতে কে ফোন করতে পারে? বন্দনা করে সকালের দিকে,

ব্রেকফাস্টের সময়। আজ নিয়মভঙ্গ করে কিছুক্ষণ আগে করেছিল। এখনই আবার করবে, মনে হয় না। কিন্তু মহিলাটিকে বিশ্বাস নেই। যে কোনও সময়, সে কোনও অঘটন সে ঘটাতে পারে।

বিরক্ত হলেন সত্যবান। ফোনটা যদি বন্দনার হয়, একবার কথা শুরু করলে আধ ঘণ্টার আগে ছাড়বেন না। আজ মনমেজাজ খুবই খারাপ। ফের বন্দনার বকবকানি শোনার মতো লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। একবার ঠিক করলেন লাইন কেটে দিয়ে রিসিভারটা নিচে নামিয়ে রাখেন। তারপর কী ভেবে ওটা তুলেই নিলেন। 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে একটু ভারী গলা ভেসে এল, 'মেজরসাহেব, ক্ষমা করবেন, অসময়ে বিরক্ত করলাম।'

সত্যবানের সারা শরীরে চমক খেলে যায়। মানুষটা অজানা, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত পরিচিত। ক'দিন আগেই সে ফোন করে সনেকপুরের জলা বোজানোর খবরটা দিয়েছিল।

সত্যবান গভীর আগ্রহে বললেন, 'না না, একেবারেই না। ইন ফ্যাক্ট যে কোনও মোমেন্টে আপনার ফোন আশা করছিলাম। আপনার নাম্বারটা জানি না, জানলে নিজেই যোগাযোগ করতাম।'

লোকটা বলল, 'আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আগেই তো বলেছি, দরকারমতো আমিই কনট্যাক্ট করে নেব। তা আমার ইনফরমেশন ঠিক ছিল তো?'

'ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট।'

'কারা জলাটা বোজাবার প্ল্যান করেছে, জানতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, গাল-কাটা গাব্বা নামে একটা গানম্যান আর তার গ্যাং।'

'ঠিকই জেনেছেন।' লোকটা বলল, 'জলা বোজানো ঠেকাতে আপনারা তো মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্যামাদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলেন। দু'চার দিন গাব্বাদের অ্যাকটিভিটি বন্ধ ছিল। ফের রাবিশ ফেলা শুরু হয়েছে, তাই না?'

অবাক বিস্ময়ে সত্যবান বললেন, 'আপনি জানেন!'

জবাব না দিয়ে লোকটা বলল, 'শ্যামাদাসের বাবারও সাধ্যি নেই গাব্বাকে আটকায়। ওর পেছনে আসল লোকটা কে, তাকে ধরতে হবে।'

'কে সে?'

'আপনারা খুঁজতে থাকুন। না পারলে আমি তো আছিই।' বলেই লোকটা একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'বাজারে ফল বেচে যে হাজারি বুড়ি আর তার নাতনি চম্পা, দু'জনেই আপনার খুব প্রিয়। বিশেষ করে চম্পাকে আপনি

যথেষ্ট স্নেহ করেন। রিসেন্টলি তার বিয়ের ব্যাপারে একটা ঝামেলা দেখা দিয়েছে। মমতা নামে একটা মেয়েমানুষ তার যে সম্বন্ধ এনেছে, সেটা আপনি নাকচ করে দিয়েছেন। ঠিক তো?'

সত্যবান স্তম্ভিত।—'আপনি এ সব জানলেন কী করে?'

লোকটার হাসির শব্দ ভেসে আসে। সে বলে, 'জানাটাই আমার কাজ। যাক গে, মমতা কিন্তু ছোড়নেবালি নয়, গাল-কাটা গাব্বাদের জুটিয়ে হামলা চালাচ্ছে, বিয়ে দিতেই হবে। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন?'

'কী বলুন তো?'

'রাজানগরকে ঘিরে পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটারের মধ্যে যেখানে যত ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি চলছে সেগুলোর পেছনে রয়েছে গাল-কাটা গাব্বা।'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'

সত্যবান কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই লোকটা ফের বলে ওঠে, 'এতেই চমকে যাবেন না। আরও বড় চমকের জন্যে তৈরি থাকুন।'

'কী সেটা?'

'কিছুদিনের মধ্যে আপনার জানাশোনা কিছু লোক আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে আমার ধারণা। ওরা আপনাকে তাদের রক্ষাকর্তা ভাবে। ওদের মুখেই সব শুনতে পাবেন।'

'কারা তারা?

'প্লিজ, আজ এ নিয়ে আমাকে কোনও প্রশ্ন করবেন না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিহ্বলের মতো সত্যবান বলেন, 'আপনার সঙ্গে কবে দেখা হতে পারে?'

লোকটা বোধ হয় তুখোড় থট-রিডার। বলল, 'দেখা হলে নিশ্চয়ই গাব্বাদের গডফাদারের নামটা জানতে চাইবেন। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকুন।' একটু থেমে তরল গলায় বলল, 'একসময় খানিকটা লেখাপড়া শিখেছিলাম। তার নাইনটি পারসেন্ট ভুলে মেরে দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের একটা পদ্যের দু'একটা লাইন মনে আছে। সন্ন্যাসী উপগুপ্ত না কে যেন কাকে বলেছিল, 'সময় যেদিন আসিবে সেদিন যাইব তোমার কুঞ্জে।' সময়টা আসতে দিন।'

সত্যবান জবাব দেবার আগেই ওধার থেকে লাইন কেটে দিল লোকটা।

চোদ্দ

পরের দু'টো দিন প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে রজতদের নিয়ে সনেকপুরে চলে এলেন সত্যবান। শ্যামাদাসকে গাব্বাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার নালিশ জানাবার পর সত্যিই মিউনিসিপ্যালিটি ওটা ভরাট করা ঠেকানোর কোনও ব্যবস্থা করেছে কিনা, স্বচক্ষে তা দেখতে চান।

হাফেজ আলিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মিউনিসিপ্যালিটির দু'জন অফিসার ফের ওখানে গিয়েছিলেন এবং গাব্বারা রাত্তিরে নিঃশব্দে এসে এই দু'দিন আর জলায় রাবিশ ফেলেনি। তার মানে শ্যামাদাসকে ধাতানোয় কাজ হয়েছে।

আপাতত তাই রাত জেগে জলা পাহারা দেবার পরিকল্পনাটা স্থগিত রাখা হয়েছে। এখন কিছুদিন রোজ সকালে গিয়ে দেখে আসা হবে, গাব্বারা ফের সনেকপুরে হানা দিচ্ছে কিনা।

জলার ব্যাপারটা পুরোপুরি ঠেকানো গেল কিনা সে সম্বন্ধে সত্যবানরা যথেষ্ট সন্দিহান। তবু সাময়িকভাবে কিছু তো একটা করা গেছে।

এবার চম্পা এবং গোপীগঞ্জ এলাকার চোদ্দটি মেয়ের বিয়ে আটকাতে হবে। সমস্যাটা মারাত্মক। সেদিন হাজারি বুড়ি বলে গিয়েছিল, গাব্বাদের নিয়ে মমতা শাসিয়ে এসেছে, দশ দিনের ভেতর বিয়ে দিতে হবে। তার মধ্যে দু'টো দিন কেটে গেছে। হাতে রয়েছে আর মোটে আট দিন।

আজ সন্ধেবেলায় 'সুরক্ষা'য় চম্পাদের বিয়ের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল।

যদিও সত্যবানদের আসল কাজটা হল পরিবেশ নিয়ে। জলাভূমি সংরক্ষণ, পশুপাখি, গাছপালা এবং বনজঙ্গল বাঁচানো ইত্যাদি, তবু তারই মধ্যে এই মানবিক সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। সত্যবান যে ধরনের মানুষ তাতে চোখ-কান বুজে থাকতে পারেন না। মেয়েগুলোকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে। কিন্তু তার পদ্ধতিটা কী?

কেউ কেউ বলল, 'সুরক্ষা'র পুরো টিমটা তো বটেই, রাজানগরের আরও কিছু লোকজন জুটিয়ে বিয়ের তিন দিন আগে থেকে গোপীগঞ্জে গিয়ে থাকবে। গাব্বারা যত বড় বন্দুকবাজই হোক, এত মানুষ দেখে ট্যাঁ ফোঁ করতে সাহস করবে না। মানে মানে সরে পড়বে। কিন্তু এই ছকটা কাটা-ছেঁড়া করে দেখা গেল, একেবারেই অবাস্তব। তিন দিন নিজেদের ঘরবাড়ি কাজকর্ম ছেড়ে

অতদূরে গিয়ে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। ঝোঁকের মাথায়, আবেগের বশে কথাটা বলা হয়েছে। আগুপিছু কিছু ভাবা হয়নি। এতগুলো লোক না হয় গেলই কিন্তু কোথায় থাকবে? তাদের খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা হবে, এসব ভাবা হয়নি।

গোপীগঞ্জ এবং তার চারপাশের গ্রামগুলো রাজানগর থানার এক্তিয়ারে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, থানায় মমতা এবং গাব্বাদের বিরুদ্ধে একটা ডায়েরি করা হবে।

কথাবার্তা যখন এই পর্যায়ে, সেদিন হাজারি বুড়িরা যেমন চলে এসেছিল তেমনি আজ এল আবদুলরা। সেই আবদুল যে বাজারে নিজের খেতের টাটকা আনাজ বেচে। সে একা আসেনি, তার সঙ্গে রয়েছে আরও তিনজন। এদেরও চেনেন সত্যবান। খগেন, জলিল আর গণেশ। ওরা থাকে সনেকপুরের উত্তরে মাইল তিনেক দূরের একটা গ্রাম—তালবনিতে। সবারই অল্পবিস্তর জমিজমা আছে। চাষবাস করে পেটের ভাত জোগাড় করে।

চকিতে সত্যবানের মনে পড়ে যায়, একদিন বাজারে আবদুল উদ্বেগের সুরে ইঙ্গিত দিয়েছিল, তাদের গ্রামগুলোতে কী একটা সংকট নাকি ঘনিয়ে আসছে এবং এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ওরা কথা বলতে আসবে। নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আজ এসেছে।

'সুরক্ষা'র মেম্বাররা প্রায় সবাই আবদুলদের চেনে। তাই পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার নেই। ওদের বসিয়ে সত্যবান আবদুলের দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেন, 'কী রে, হঠাৎ চলে এলি!'

আবদুল ভয়ার্ত সুরে বলে, 'বড় বাবা, অ্যাদ্দিন কানাঘুষোয় শুনছেলুম, এবেরে মাথায় বজ্জঘাত হতি চলেচে।'

সত্যবান ঝুঁকে জিজ্ঞেস করেন. 'বলেছিলি দু'তিন মাস পর এসে কী একটা বিপদের কথা বলবি। তা হঠাৎ কী এমন হল যে আজই চলে এসেছিস?'

আবদুল যা বলল তা এইরকম। কাল এক দঙ্গল লোক তাদের তালবনি এবং তার আশেপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে জানিয়েছে, চাষের জমি বেচতে হবে। তার জন্য খুব ভাল দাম পাওয়া যাবে। এখন বিঘে প্রতি যা দর তার দু'গুণ, তিন গুণ। খেপে খেপে নয়, পুরোটা নগদে। এককালীন।

যারা এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল গাল-কাটা গাব্বা এবং হাতপোড়া নেলো। দু'জনেই মার্কামারা বন্দুকবাজ।

সত্যবান চমকে ওঠেন, দেখা যাচ্ছে, গাব্বা নামের এই ক্রিমিনালটি সর্বত্র বিরাজ করছে। সনেকপুরে, গোপীগঞ্জে, তালবনিতে। এই খুনেটাকে নানা নোংরা কাজে যে লাগানো হচ্ছে তা বোঝাই যাচ্ছে। জলা ভরাট, গ্রামের

যুবতীদের বিয়ের ব্যবস্থা করা, এ সবের পেছনে যে দুরভিসন্ধি রয়েছে তা আঁচ করা যায়। কিন্তু কৃষিজমির দিকে ওরা হাত বাড়িয়েছে কেন?

সত্যবান রীতিমতো ধন্দে পড়ে যান। বলেন, 'চাষের জমি দিয়ে ওরা কী করবে? তোরা জানতে চাসনি?'

আবদুল বলে, 'তা আর চাইনি? তা গাব্বারা বুললে অত কতায় তোমাদের দরকারটা কী? কাঁড়ি কাঁড়ি ট্যাকা পাচ্চ—ব্যস। তভু আমরা শুদোলুম, জমিনই আমাগের সব্বস্ব, চাষের ওপর নিভ্‌ভর। বাপ-দাদার জমিন বেচি দিলি যাব কুতায়, খাব কী?'

'শুনে গাব্বারা কী বললে?'

'বুললে অত অত ট্যাকা পাচ্চ, ব্যবসা করবে। ধান ঠেঙে (থেকে) আনাজ ঠেঙে যা রোজকার হয় তার তেগুনো চৌগুনো (তিন গুণ চার গুণ) আয় হবে। কিচু ট্যাকা পোস্টাপিসে রাকবে। মাসের শেষে সুদ পাবে। পায়ের ওপরে পা তুলি আরামে জেবন কেইটে ঝাবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর দম নিয়ে ফের শুরু করল আবদুল, 'গাব্বারা আরও বুললে, হুড়পাড় (তাড়াহুড়ো) করতি হবে নি। ধীরি ধীরি অন্য কুতাও ঘর তৈরির জন্যি জায়গা দেকতি থাকো। তিন চার মাস বাদে বিকিকিনি হবে। তবে হ্যাঁ, কোনওরকম ঝামেলি করা চলবে নি। চাষের জমিন দিতিই হবে।'

কপালে ভাঁজ ফেলে শুনতে লাগলেন সত্যবান। উত্তর দিলেন না। গাছপালা, পাখপাখালি, জলা, গ্রামের যুবতী মেয়ে, চাষের জমি—লুটের বাজারটা দেখা যাচ্ছে বেশ লম্বা। যেভাবে গাব্বারা চারদিকে থাবা বাড়াচ্ছে তাতে কিছুই আর বাকি থাকবে না। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওরা গিলে ফেলবে। লুণ্ঠনের এমন গোপন ব্যাপক ষড়যন্ত্র যে চলছে আগে সামান্যই টের পাওয়া গিয়েছিল। ক্রমশ তার সর্বনাশা, ভয়ঙ্কর চেহারাটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে।

আবদুল থামেনি। বলেই চলেছে, 'গাব্বাদের কতা শুনে তরাসে হাত-পা পেটের ভিত্‌রি সেঁদিয়ে গেল বড় বাবা। তাই দৌড়ুতে দৌড়ুতে চলে আলাম। চকি (চোখে) আঁধার দেকতিচি (দেখছি)। অখুন আপনারাই ভরসা। কী করব বুলে দ্যান—'

সত্যবান দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। একটার পর একটা সমস্যা ঝাঁক বেঁধে এসে পড়ছে। আরও কত যে আসবে, কে জানে। 'সুরক্ষা'র মেম্বারদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এদের কথা তো শুনলে। এখন কী করা?'

নিশানাথ ভট্টাচার্য ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তিনিও রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বললেন, 'এমন সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার যে চলছে, এ তো কল্পনাই করা যায় না। দেশটা কোন জাহান্নামের দিকে চলছে!'

পরমেশ ধর দেশের মতো বিশাল সমস্যা নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নন। বললেন, 'সত্যিই তো, জমি হাতছাড়া হলে এরা তো শেষ হয়ে যাবে।'

এদিকে বিহ্বল ভাবটা অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছিলেন সত্যবান। মুখটা শক্ত দেখাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে কিছু একটা স্থির করে ফেলেছেন। আবদুলদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চিন্তা করিসনি। ওরা তিন চার মাস সময় দিয়েছে তো। তার ভেতর কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কেউ জমি দিবি না। রাত হয়েছে, অনেক দূর যেতে হবে। এবার উঠে পড়।'

আবদুলরা চলে যাবার পর পরমেশ ধর বললেন, 'এত প্রবলেম কী করে সামলানো যাবে? অসম্ভব।' একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'পরিবেশ নিয়ে আমাদের কাজ। চাষের জমির ব্যাপারে মাথা গলানো ঠিক নয়।'

সত্যবান বললেন, 'আবদুলরা কত দিনের চেনা! গরিব মানুষ; জমি বেচে দিলে যে নগদ টাকা হাতে পাবে, তাতে মাথা ঘুরে যাবে। তিন দিনে সব ফুঁকে দেবে। তারপর খাবে কী? উপোস দিয়ে মরতে হবে। ওদের জন্যে কিছু করা দরকার।' একটু থেমে দৃঢ় স্বরে বললেন, 'করা দরকার নয়। করতেই হবে।'

বাকি সবাই সায় দিল, সত্যবান যা বলেছেন সেটাই ঠিক। তালবনি অঞ্চলের মানুষগুলোকে বাঁচাতেই হবে।

পনেরো

আজও রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর তাঁর ইজিচেয়ারটিতে শরীর ছেড়ে দিয়েছেন সত্যবান। কিছুক্ষণ আগে আবদুলরা যে সমস্যা নিয়ে হাজির হয়েছিল সেটাই মাথায় ঘুরছে। হুমকি দিয়ে চার পাঁচটা গ্রামের সমস্ত কৃষিজমি দখল করতে চাইছে গাব্বারা। দাম দেবে ঠিকই। কিন্তু এত জমি দিয়ে কী হবে? কারা এই বন্দুকবাজগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে?

এত সব প্রশ্নে যখন মাথার ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে, সেই অচেনা লোকটার ফোন এল।—'কী মেজর সাহেব, আমার কথাটা মিলে গেল তো? নতুন ক্রাইসিস হাজির হয়েছে কিনা?'

সত্যবান আজ আর আগের মতো ততটা অবাক হলেন না। তিনি জেনেই গেছেন, লোকটা ভূভারতের যাবতীয় খবর রাখে। তালবনি এলাকার কৃষিজমি কিনে নেবার জন্য বন্দুকবাজদের লাগানো হয়েছে, এটা সে যে জানবে তার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই।

সত্যবান বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছে।'

লোকটা বলল, 'সময় হয়েছে। এই বার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা দরকার।'

ফোনটা কানে লাগিয়ে কাত হয়ে ছিলেন সত্যবান। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। টের পেলেন স্নায়ুমণ্ডলীতে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। বললেন, 'আপনি রবীন্দ্রনাথ আওড়ে বলেছিলেন, আমার কুঞ্জে আসবেন। কবে, কখন আসতে পারবেন বলুন। আমি ওয়েট করব।'

'নো স্যার, নো। আপনার ওখানে আমার যাওয়া উচিত হবে না। রাজানগরে আমিও থাকি। আমার বাড়িতে আপনাকে ইনভাইট করতাম, কিন্তু সেটাও ঠিক নয়। আসলে আপনাকে আর আমাকে একসঙ্গে কেউ দেখে ফেলুক, সেটা চাইছি না।'

সত্যবান ধন্দে পড়ে যান, 'তাহলে দেখা হবে কী করে?'

'লেক টাউনে আমার মেয়ের একটা ফ্ল্যাট আছে। মেয়ে-জামাই আমেরিকায় থাকে, মাঝে মাঝে এসে দিনকয়েক কাটিয়ে যায়। আপনাকে ঠিকানাটা দিচ্ছি,

কাল সন্ধেয় কাইন্ডলি একটু কষ্ট করে চলে আসবেন। কথাবার্তা সেখানেই হবে।'

সত্যবানের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। কঠোর গলায় বলেন, 'মিস্টার, আপনার নাম আমি জানি না। আমি আর্মির লোক, কোনও রকম মাঙ্কি বিজনেস পছন্দ করি না।'

লোকটা অবাক। বলে, 'এ কী বলছেন! ইউ মে টেক মি ফর আ জেন্টেলম্যান। আমি ভদ্র বংশের ছেলে। কারও সঙ্গে বজ্জাতি করব, এ আমি ভাবতেই পারি না।'

সত্যবান একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'অলরাইট, আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। তবু স্পষ্ট করে জানিয়ে দিই, আমার সঙ্গে সারাক্ষণ আর্মস থাকে। অ্যান্ড আই অ্যাম আ ক্র্যাকশট। আমার বুলেট কখনও ফসকায় না, টার্গেটে ঠিক লাগবেই।'

লোকটা বলে, 'জানি। বুঝতেই পারছি, আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি। লেকটাউনে এলে বুঝতে পারবেন আমি সত্যিই ভদ্রলোক আর—'

'আর কী?'

'আমরা দু'জনেই দু'জনকে চিনি। তবে আগে কখনও আলাপ হয়নি।'

সত্যবানের চমক লাগে।—'কে আপনি?'

লোকটা বলল, 'কালই তো আমরা মিট করছি। তখনই দেখতে পাবেন।'

আর কোনও প্রশ্ন করা বৃথা। লোকটা কিছুতেই নিজের পরিচয় জানাবে না। নিজেকে রহস্যের আবরণে ঘিরে রাখা বোধ হয় তার স্বভাব। অগত্যা একটা দিন অপার কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।

একটু চুপচাপ।

তারপর লোকটা বলে, 'আমার ইনফরমেশন অনুযায়ী নানা জায়গায় ঘুরে তো দেখলেন, গাল-কাটা গাব্বা আর তার গ্যাংটা কত ধরনের ক্রাইম করে যাচ্ছে। তাদের ঠেকাবার জন্যে কিছু করতে পারলেন কি?'

সত্যবান জানালেন, সনেকপুরের জলার ব্যাপারে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্যামাদাস চক্রবর্তীর কাছে কমপ্লেন করেছেন। তালবনির কৃষিজমির খবরটা সবে পেয়েছেন। এ বিষয়ে কিছু করা সম্ভব কিনা, বুঝতে পারছেন না। তবে ভেবেচিন্তে কোনও একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আর চম্পা এবং আরও চোদ্দটি মেয়ের বিয়ে আটকানোর জন্য থানায় যাওয়া উচিত ছিল, যাওয়া হয়নি। শিগগিরই যাবেন।

'এক কাজ করুন, কাল লেক টাউনে আসার আগে থানায় গিয়ে কমপ্লেনটা লেখাবেন। ওখানে কাজ না হলে এস পি'র সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি কী বলেন, শুনুন—'

লোকটা সত্যবানের মনে খোঁচা মেরে সংশয় জাগিয়ে তুলেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'থানায় গেলে কাজ হবে না বলছেন?'

লোকটা বলল, 'এখন আমি কিছুই বলব না। নিজে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন। অনেকক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করলাম। কাল তো দেখা হচ্ছেই। আসল কথা তখনই হবে। গুড নাইট।'

ষোলো

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে পরমেশ ধরকে সঙ্গে করে রাজানগর থানায় চলে এলেন সত্যবান।

ওসি মল্লিনাথ ভৌমিকের সঙ্গে সত্যবানের অনেক দিনের পরিচয়। বয়স পঞ্চাশের আশপাশে। বেশ সুপুরুষ। পুলিশ অফিসার বলতে যে ভীতিকর চেহারা চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তিনি তার একেবারে বিপরীত। খুবই ভদ্র, কথাবার্তা চমৎকার, মুখে সবসময় হাসি লেগেই আছে।

সত্যবানকে দেখে মল্লিনাথ যতটা অবাক, তার চেয়ে অনেক বেশি খুশি হলেন।—'আপনি যে থানায় আসবেন, ভাবতেই পারিনি। কী সৌভাগ্য! বসুন বসুন।'

এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে এসেছেন বলা সত্ত্বেও রেহাই পাওয়া গেল না। প্রচুর খাবারদাবার এবং চা এসে হাজির হল।

অগত্যা একটা সন্দেশ খেয়ে চায়ের কাপ তুলে নিলেন সত্যবান।

চায়ের সঙ্গে নানারকম গল্পও চলছে। পরিবেশ রক্ষায় 'সুরক্ষা' যে বিরাট কর্তব্য পালন করছে সে ব্যাপারে মল্লিনাথ দারুণ উচ্ছ্বসিত। নানা কথার ফাঁকে একসময় তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা কি কোনও দরকারে এসেছেন?'

সত্যবান আস্তে মাথা নাড়ে।—'হ্যাঁ।'

'বলুন—'

'একটা বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই।'

'নিশ্চয়ই।' মল্লিনাথ জোর দিয়ে বললেন, 'যা করতে বলবেন তাই করব। মেজর সাহেব।'

জলা ভরাট এবং চম্পা আর চোদ্দটি মেয়ের ব্যাপার সবিস্তার জানিয়ে সত্যবান বলেন, 'গাব্বা আর তার গ্যাংটা এ নিয়ে ভীষণ জুলুম করছে। সনেকপুরের ওয়েটল্যান্ডটার সমস্যা নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি ভাবছে। চেয়ারম্যান শ্যামাদাস চক্রবর্তী কথা দিয়েছেন, জলাটা কিছুতেই ভরাট করতে দেবেন না। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি আর্জেন্ট হল চম্পাদের বিয়ে। গাব্বারা যেভাবে থ্রেটেন করেছে, ইমিডিয়েটলি ওদের এগেনস্টে কড়া স্টেপ নেওয়া দরকার। তেমন বুঝলে হাজতে ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত।'

মল্লিনাথের মুখ থেকে হাসিখুশি ঝলমলে ভাবটা ধীরে ধীরে মুছে যায়। তাঁকে কেমন যেন বিব্রত দেখায়। বলেন, 'যা বললেন সেটা খুবই সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু—'

'কী?'

'দেখি কী করা যায়—'

'আপনি অন্তত কমপ্লেনটা লিখে নিন।'

'দরকার নেই, আপনি বলেছেন সেটাই যথেষ্ট।'

অনেকবার বলা সত্ত্বেও অভিযোগটা লেখানো গেল না।

থানা থেকে বেরিয়ে সত্যবানরা এস পি'র সঙ্গে দেখা করলেন। আগেই পরিচয় ছিল। তাঁর নাম দিবাকর লাহিড়ি। খাতির করে সত্যবানদের বসিয়ে, চা খাইয়ে, মনোযোগ দিয়ে গাব্বাদের কথা শুনলেন। তারপর ওসি মল্লিনাথের মতোই তাঁর চোখেমুখে অস্বস্তি দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। খানিকটা নিরুৎসুক সুরে বললেন, 'আপনি এসেছেন। কিছু একটা করা তো উচিত। একটু ভাবি—'

সত্যবানের মনে হল, গাব্বার ব্যাপারে পুলিশের দিক থেকে বিশেষ কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। মনটা খারাপ হয়ে গেল তাঁর।

থানায় এবং এস পি'র অফিসে সঙ্গী ছিলেন পরমেশ ধর। কিন্তু সন্ধেবেলায় একাই লেকটাউনে এলেন সত্যবান। সেই অচেনা লোকটার তেমনই নির্দেশ ছিল।

ফ্ল্যাটটা বিশাল এক হাই-রাইজের সেভেনথ ফ্লোরে। লিফটে সেখানে পৌঁছে ডোর বেল টিপতেই যিনি দরজা খুলে দিলেন তাঁর সঙ্গে যে এখানে দেখা হবে তা ছিল অভাবনীয়।

ভদ্রলোক রাজানগর এলাকার প্রাক্তন এম এল এ শেখরনাথ চট্টরাজ। গত দু'টো নির্বাচনে তিনি খুব অল্প মার্জিনে হেরে গেছেন। এখনও ওই অঞ্চলে তাঁর এবং তাঁদের পার্টির যথেষ্ট দাপট রয়েছে।

অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন সত্যবান।

শেখরনাথ হাতজোড় করে হাসিমুখে বলেন, 'বিরাট একটা সারপ্রাইজ দিলাম তো?'

সত্যবান বললেন, 'তা দিয়েছেন—'

'আসুন, আসুন।'

শেখরনাথ আগেই জানিয়েছিলেন ফ্ল্যাটটা তাঁর মেয়ে-জামাইয়ের। ভেতরে গিয়ে দেখা গেল, চমৎকার সাজানো অ্যাপার্টমেন্টের মাপ কম করে দেড় হাজার স্কোয়ার ফিট।

মস্ত ড্রইংরুমে সত্যবানকে বসিয়ে শেখরনাথ বললেন, 'একজন আরেক জনকে চিনলেও এই প্রথম আমাদের আলাপ হচ্ছে। কী ধরনের ড্রিংক আপনার পছন্দ? হুইস্কি? রাম?'

'ওনলি টি।'

দূরে একটা মাঝবয়সি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। শেখরনাথ আগেই জানিয়েছিলেন, এই ফ্ল্যাটের একজন কেয়ারটেকার আছে। ওই লোকটা খুব সম্ভব তাই। শেখরনাথ তাকে চা আনতে বললেন।

শুধু চা-ই না, নানারকম সুখাদ্যও এনে টেবলে সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটা।

চায়ের কাপ তুলে নিয়ে সত্যবান বললেন, 'কাজের কথা শুরু হোক। আমাকে এখানে ডেকে আনার কারণটা কী? কী চান আমার কাছে?'

শেখরনাথ বললেন, 'অনেক কিছু। তার আগে জিজ্ঞেস করি, থানায় আর এস পি'র অফিসে গিয়ে গাব্বাদের নামে কমপ্লেন তো করে এলেন। কিছু কাজ হবে বলে মনে হয়?'

লোকটা যে অনেকদিন ধরেই তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখছে সেটা আরেক বার টের পাওয়া গেল। সত্যবান উত্তর দিলেন না।

শেখরনাথ হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'কিস্‌সু হবে না। গাব্বার পেছনে কে আছে জানেন?'

'কে?'

'এখনকার এম এল এ নবীনকিশোর সাহা। পুলিশই বলুন আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অন্য ডিপার্টমেন্ট বলুন, কারও সাধ্য নেই গাব্বাদের গায়ে হাত ছোঁয়ায়। সনেকপুরের জলার মতো অনেক ওয়েটল্যান্ড বুজিয়ে প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। বিয়ের নাম করে পাচার করা হবে শ'য়ে শ'য়ে মেয়েকে। আপনারা রুখতে পারবেন না।'

এই ভয়টাই পেয়েছিলেন সত্যবান। রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করেন, 'আর তালবনির ওই জমিগুলো?'

শেখরনাথ বললেন, 'গভর্নমেন্ট ভাবছে ওখানে একটা টাউনশিপ তৈরি করবে। অবশ্য এখনও কিছু ঠিক হয়নি। তবু আগেভাগে তালবনি এরিয়ার জমি কিনে রাখার চেষ্টা করছে প্রোমোটাররা। যদি টাউনশিপ হয়, তখন সোনার দরে

জমি গভর্নমেন্টের কাছে বেচবে। এর পেছনে কত টাকার লেনদেন হবে ভাবতেও পারবেন না। আর সেই অ্যামাউন্টের একটা বড় অংশ কার গর্ভে ঢুকবে আশা করি, বুঝতেই পারছেন। গাব্বারা তো টুলস। ওদের কাজে লাগানো হচ্ছে মাত্র।'

হতবুদ্ধির মতো সত্যবান তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'এসব বন্ধ করা দরকার। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন শেখরনাথ। —'নিশ্চয়ই দরকার। তার জন্যে প্রয়োজন ক্ষমতা হাতে পাওয়া, মানে পলিটিক্যাল পাওয়ার, যা দিয়ে গভর্নমেন্ট ফর্ম করা যায়।' একটু চুপ করে থাকার পর ফের শুরু করেন, 'মেজর সাহেব, নিশ্চয়ই শুনেছেন এবারের ইলেকশনের খুব দেরি নেই। গত বার আমি সামান্য মার্জিনে হেরেছি। আমাদের পার্টিও অল্পের জন্যে পাওয়ার দখল করতে পারেনি। এবার আমাদের চান্স খুব ব্রাইট। আমি যদি জিততে পারি রাজানগরের সমস্ত কোরাপশন, সব নোংরামি চিরকালের মতো বন্ধ করে দেব। আপনারা যে জন্যে লড়ছেন—কৃষিজমি, জলাজমি বাঁচানো, নারীপাচার ঠেকানো— আমিও তাই চাই। ক্ষমতা হাতে না পেলে এসব করা তো সম্ভব নয়। আর সেই জন্যে—'

'সেই জন্যে কী?'

'আপনার সাহায্যটা ভীষণ প্রয়োজন।'

সরাসরি শেখরনাথের চোখের দিকে তাকান সত্যবান। —'আমি কী করে সাহায্য করব? রাজনীতির আমি কিছুই বুঝি না।'

'বুঝিয়ে দিচ্ছি—'

শেখরনাথ সবিস্তার যা বললেন তা এই রকম। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁরা রাজানগরে খুব বড় আকারে একটা নির্বাচনী সভার আয়োজন করছেন। তাঁরা সত্যবানকে প্রধান বক্তা হিসেবে মঞ্চে তুলতে চান। সত্যবান এই অঞ্চলের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, সবচেয়ে সৎ মানুষ। তিনি যা বলবেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। সবাই তা মনোযোগ দিয়ে তো শুনবেই, তাঁর প্রতিটি শব্দ মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করবে। সভায় তিনি স্থানীয় এম এল এ গাব্বার মতো ক্রিমিনালদের কাজে লাগিয়ে কিভাবে সমাজের পক্ষে জঘন্য ক্ষতিকর কাজ করে চলেছে তার বিশদ বিবরণ শ্রোতাদের কাছে পেশ করবেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেখরনাথ যে কত ধুরন্ধর, লহমায় ধরে ফেলেন সত্যবান। তাঁকে মই হিসেবে কাজে লাগিয়ে এবারের নির্বাচনে তিনি তরে যেতে চাইছেন।

ভালমানুষের মতো মুখ করে সত্যবান বলেন, 'এসব আপনিও জানেন। নিজেও তো বলতে পারেন।'

'আমি ওদের রাইভ্যাল। বিরুদ্ধ পক্ষ। লোকে ভাববে গায়ের জ্বালায় আমি কাদা ছিটোচ্ছি। কিন্তু আপনার ক্লিন ইমেজ। আপনাকে নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। আপনার ব্যাপারটাই আলাদা।'

চকিতে একটা কথা মনে পড়ে যায় সত্যবানের। বলেন, 'আচ্ছা, বছর বারো আগে আপনি যখন এম এল এ ছিলেন, কী একটা টাকাপয়সা তছরুপের মামলা হয়েছিল না আপনার বিরুদ্ধে? তারপর যখন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হন—'

শেখরনাথ চঞ্চল হয়ে ওঠেন। দু'হাত ঝাড়া দিতে দিতে বলতে থাকেন, 'ওসব মিথ্যে। ফল্‌স্‌ অ্যালিগেশন। তাহলে ওই কথাই রইল মেজর সাহেব, আমাদের মিটিংয়ে—'

তিনি শেষ করার আগেই উঠে পড়েন সত্যবান।

শেখরনাথও উঠে দাঁড়ান।—'কী হল?'

'আমি যাচ্ছি। আপনাদের মিটিংয়ে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। গাব্বাদের সমস্যাটা আমাদের 'সুরক্ষা'ই সামলাতে চেষ্টা করবে। চলি—'

'কিন্তু পলিটিক্যাল পাওয়ার—'

শেখরনাথের কথাগুলো কানে ঢোকে না সত্যবানের। তিনি ততক্ষণে ফ্ল্যাটের বাইরে চলে গেছেন।

সতেরো

সারারাত ভাল ঘুম হল না সতবানের। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকেন, তারপর উঠে ঘরময় অস্থির পায়ে হাঁটাহাঁটি করেন। মাথার ভেতর অবিরল একটা চিন্তাই চলছে। গোপীগঞ্জ এলাকার চম্পাদের বাঁচাতে হবে, সনেকপুরের জলাজমি এবং তালবনির কৃষিজমি রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু কিভাবে?

ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত সত্যবানের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে যায়। এই সব সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায় তিনি পেয়ে গেছেন।

সকালে উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে, পোশাক পালটে বেড়রুমে ফিরে সত্যবান দেখলেন লক্ষ্মী চা'টা নিয়ে হাজির।

নীরবে চা খেয়ে একতলায় নেমে আসতেই চোখে পড়ল, বাড়ির গেট খোলা হয়েছে। সেখানে মাথায় বিশাল পাগড়ি, হাতে প্রকাণ্ড লাঠি নিয়ে হাড্ডিসার ডিগডিগে চেহারার বগুলা সিং দাঁড়িয়ে আছে। গেটের বাইরে রাস্তায় তাঁর সাইকেল বাহিনী অপেক্ষা করছে। পাবু যিশু তপু রজত এবং আরও কয়েকজন।

নিজের সাইকেলটা না নিয়ে সামনের বাগান পেরিয়ে গেটের কাছে চলে এলেন সত্যবান। বগুলা সিং যথারীতি ফৌজি কায়দায় তাঁকে লম্বা স্যালুট ঠুকল। তিনি বাইরে বেরুতেই প্রাতর্ভ্রমণের সঙ্গীরা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে সবিস্ময়ে বলে ওঠে, 'এ কী! আপনার সাইকেল কোথায়? আনতে ভুলে গেলেন নাকি?'

সত্যবান বললেন, 'নো। আজ আর বেড়াতে যাচ্ছি না।'

সবাই হাঁ হয়ে যায়। এমন চমকপ্রদ কথা তারা যেন ইহ জন্মে আগে কখনও শোনে নি। কানে শুনেও কারও বুঝিবা বিশ্বাস হচ্ছিল না। বিস্ময়টা খানিক থিতোলে একসময় জিগ্যেস করল, 'হঠাৎ মেজের সাহেবের কী হল? সিরিয়াস অসুখ বিসুখ না হলে তাঁর ডেইলি রুটিন তো কোনও দিন বদলাতে দেখিনি। এনি প্রবলেম?'

'নো প্রবলেম। আজ প্রাতর্ভ্রমণটা বন্ধ করলাম একটাই কারণে!'

'কী সেটা?'

'সব জানতে পারবি। আজ তোরা কেউ কলেজ ইউনিভার্সিটি বা অফিসে যাবি না। এক্ষুনি তোদের একটা কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ?'

''সুরক্ষা'র যত জন মেম্বারকে পারিস সঙ্গে করে এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের অফিসে চলে আয়। বলধি, আমি ডেকেছি। ভীষণ দরকার।'

পাবুরা আর কোনও প্রশ্ন করল না। চটপট সাইকেলে উঠে তড়িৎগতিতে রাজানগরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর সত্যবান বগুলা সিংকে 'সুরক্ষা'র দরজা খুলে দিতে বললেন। হুকুম পাওয়া মাত্র বগুলা লিকলিকে পায়ে দৌড়ে গিয়ে তালা খুলল।

সত্যবান ভেতরে ঢুকে সব জানালা টানালা খুলে নিজের চেয়ারে বসলেন।

এক ঘণ্টাও লাগল না, মিনিট চল্লিশের ভেতর প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জনকে এনে হাজির করল পাবুরা। এদের বেশির ভাগই যুবক, আঠারো থেকে তিরিশের মধ্যে বয়স। বয়স্কদের বেশির ভাগেরই শরীর স্বাস্থ্য ভাল নয়, অনেকেই রুগ্‌ণ, অসুস্থ। তাঁদের পক্ষে এই সকালবেলায় বাড়ি থেকে বেরুনো কষ্টকর। তবু কয়েকজন—নিশানাথ ভট্টাচার্য, পরমেশ ধর আর অবনীনাথ নন্দী ছুটে এসেছেন।

সবাইকে বসিয়ে সত্যবান বললেন, 'গ্রামের মেয়ে, চাষের জমি—এসব নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলোর একটা সলিউশনের পথ খুঁজে পেয়েছি। তোমাদের সেটা জানাবার জন্যে এই সকালবেলাতেই ডাকিয়ে এনেছি। কেননা আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই। এখনই কাজ শুরু করে দিতে হবে।'

সবার হয়ে পরমেশ ধর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করতে হবে?'

সত্যবান তাঁর পরিকল্পনার কথা সবিস্তার জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'সুরক্ষা'র মেম্বাররা সবাই জানে গোপীগঞ্জের চোদ্দটা মেয়ে, সনেকপুরের জলা এবং তালবনির কৃষিজমির দিকে বন্দুকবাজ গাল-কাটা গাব্বা এবং তার গ্যাংটা হাত বাড়িয়েছে। তার পেছনে রয়েছে এই অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতা। এই নেতার ছাতার তলায় থাকায় কারও সাহস নেই গাব্বার গায়ে হাত ঠেকায়। একমাত্র উপায় তার আশ্রয়দাতা জননেতাটির পরিচয় এলাকার বাসিন্দাদের কাছে প্রকাশ করা। সাধারণ নির্বাচনের খুব বেশি দেরি নেই। এই পরিস্থিতিতে যদি জানাজানি হয় নেতাটি গাব্বার মতো এক অ্যান্টি-সোশালকে জামাই আদরে পুষছেন, তাঁরই জন্য বন্দুকবাজটা হাজারটা কুকর্ম করে পার পেয়ে যাচ্ছে, তা হলে নেতাটি নিশ্চয়ই ভড়কে যাবেন। এই ভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারলে ভয় পেয়ে গাব্বাকে যাবতীয় দুষ্কর্ম থেকে

আটকে দেবেন। কেননা নির্বাচন বড় কঠিন জিনিস। মানুষ খেপে গেলে তাঁকে ভোট দেবে না। মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর ইলেকশনে জিততে না পারলে ক্ষমতা হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবে। ক্ষমতা না থাকা মানে তোমার দাম কানাকড়িও না। বিপদে পড়লে রাজনৈতিক নেতারা অ্যান্টি-সোশাল কেন, নিজের ছেলেকেও বিসর্জন দেয়।

উৎসাহে সবার চোখমুখ ঝকমক করতে থাকে। তারা জানায় এভাবেই গাল-কাটা গাব্বাদের ঠেকানো সম্ভব।

নিশানাথ কিন্তু প্রথমটা চুপ করে রইলেন। তাঁর ধাতটা অন্যরকম। কেউ কিছু বললে, এমনকি তিনি সত্যবান দণ্ডচৌধুরি হলেও, নিশানাথ মেনে নেবেন তা ভাবার কারণ নেই। সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে তবেই তাঁর মতামত দিয়ে থাকেন। বললেন, 'সত্যবানদা, আপনি যা বলেছেন, যুক্তি বা স্ট্রাটেজির দিক থেকে সেটা ঠিক। কিন্তু আমার দু'-একটা প্রশ্ন আছে।'

সত্যবান বললেন, 'করে ফেল।'

'গাব্বারা খুব তাড়াতাড়িই চম্পাদের বিয়ের জন্যে গোপীগঞ্জে হানা দেবে। তার আগে এত অল্প সময়ে রাজানগর কনস্টিটিউন্সির লোকজনকে কিভাবে ওদের পেছনে কোন পলিটিক্যাল পার্টি বা লিডার আছে তা জানাবেন?'

'সেটাও ভেবে রেখেছি।'

সত্যবান তাঁর রণকৌশলটা বুঝিয়ে দিলেন। আজই দশটা অটো ভাড়া করে প্রতিটিতে 'সুরক্ষা'র দু'জন করে তরুণ মেম্বার মাইক নিয়ে বসবে। তারা রাজানগরের প্রতিটি মহল্লায়, বড় রাস্তা থেকে অলিগলিতে ঘুরে গাব্বারা কী ধরনের অপকর্ম করতে চলেছে মাইকে সেসব তো বলবেই, সেই সঙ্গে এও জানাবে, চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর গাব্বাদের শয়তানি বন্ধ না হলে তার মদতদাতা কে এবং কোন পার্টি তা একটা মিটিং করে অঞ্চলের সব মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই জনসভায় ডাকা হবে খবরের কাগজ এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিকদের। সারা পশ্চিম বাংলা লহমায় জেনে যাবে আড়ালে থেকে কোন জননেতা গাব্বাদের পুষছেন। গ্রামের মেয়েদের বিয়ের নামে অন্য রাজ্যে পাচার করে, জলাজমি বুজিয়ে এবং গায়ের জোরে কৃষিজমি চাষীদের বিক্রি করতে বাধ্য করে লাখ লাখ টাকা নেতাটি পেয়ে থাকেন, তাও লোকে জানতে পারবে।

সত্যবান বলতে লাগলেন, 'আজ দুপুর থেকে সন্ধে অব্দি এই অপারেশন চলবে। আমার ধারণা তার মধ্যেই লিডারটি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কেননা ভাবমূর্তি নষ্ট হলে তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

নিশানাথকে দেখে মনে হল, সত্যবানের এই পরিকল্পনায় খুশি হয়েছেন।—'ভেরি গুড প্ল্যানিং। কিন্তু—'

'আবার কী?'

'আমাদের কনস্টিটিউয়েন্সি তো রাজানগরকে নিয়েই নয়। চারপাশের পঁচিশ ত্রিশটা গ্রামও তার মধ্যে পড়ে। অটো নিয়ে শহরের মধ্যে ঘুরলে গ্রামের মানুষজন জানবে কী করে?'

সত্যবান হাসলেন।—'লিডারটি এই শহরেই থাকেন। তাঁর কর্ণে বার্তাটি যাতে পৌঁছায় সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানলেই কাজ হয়ে যাবে।'

একটু নীরবতা।

তারপর নিশানাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'সবই তো বললেন কিন্তু এই মহান লিডারটি কে তার নামটা জানান নি।'

বাকি সবাই ছেঁকে ধরে, 'হ্যাঁ, বলুন বলুন—'

সত্যবান বললেন, 'একটু ধৈর্য ধব। সন্ধেবেলায় সবাই আমরা ফের এখানে জড়ো হচ্ছি। তখন নেতাটির নাম জানাব।' আসলে গাব্বাদের গড-ফাদারের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তিনি তা দেখতে চান। যাদের মাইক দিয়ে পাঠাবেন তাদের বয়স কম। রক্ত গরম। জননেতাটির নাম আগেভাগে জানিয়ে দিলে রাস্তায় বেরিয়ে হঠাৎ কী করে বসবে, ঠিক নেই।

সত্যবান যা ছকে দিয়েছিলেন, দুপুর থেকে তা শুরু হয়ে গেল। তিনি ভেবেছিলেন সন্ধে অব্দি অপেক্ষা করতে হবে। সেই সঙ্গে একটু সংশয় যে ছিল না তা নয়। যারা রাজনীতি করে তাদের শতকরা নিরানব্বই ভাগই ধূর্ত, ধড়িবাজ। এমনও হতে পারে, যে জাঁতিকলটা তিনি পেতেছেন তাতে লোকটা পা-ই ঢোকাল না। তখন আবার নতুন ছক তৈরি করতে হবে।

অন্য দিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর দোতলায় নিজের ঘরে গিয়ে একটু জিরিয়ে নেন সত্যবান। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ টাগজ পড়েন। কোনও কোনও দিন একটু ঘুমিয়েও নেন। আজ কিন্তু খাওয়া শেষ করেই 'সুরক্ষা'র অফিসে চলে এলেন। যদিও তাঁর স্থির বিশ্বাস, যে রণকৌশল তিনি প্রয়োগ করেছেন তার একটা নিশ্চিত ফল পাওয়া যাবে। তবু ভেতরে ভেতরে রীতিমতো উত্তেজনা টের পাচ্ছিলেন। সময় যত লম্বা পায়ে ছুটছে, উত্তেজনাটাও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে।

সাড়ে চারটে যখন বাজল, লক্ষ্মী বিকেলের চা দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে কিছু খাবারদাবার। আজ সে করেছে ক্ষীরের মালপো। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা এই উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তুটি সত্যবানের ভারি পছন্দের। অন্য সময় হলে খুশিতে হই হই করে উঠতেন। আজ কিন্তু সেরকম কোনও লক্ষণই দেখা গেল না।

খেলেন ঠিকই, কিন্তু একেবারেই চুপচাপ, অন্যমনস্ক।

লক্ষ্মী একধারে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে মুখে কিছুটা উদ্বেগের ছাপ। হয়তো সে মালপোর জন্য তারিফ আশা করেছিল। ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করল, 'বাবা, মালপোটা কি আপনার ভাল নাগে নি?'

সামান্য চমকে ওঠেন সত্যবান। লক্ষ্মীর মনোভাবটা আন্দাজ করে নিয়ে ব্যস্তভাবে বলেন, 'খুব ভাল লেগেছে। চমৎকার। আমি অন্য একটা ভাবছিলাম কিনা, তাই খেয়াল করে তোকে বলি নি।' উচ্ছ্বাসের সুরে বলতে লাগলেন, 'মালপোটা তুই যা বানাস, কোনও ময়রা তা করতে পারবে না। এক্সেলেন্ট!'

লক্ষ্মীর মুখ আলো হয়ে ওঠে। সত্যবানের খাওয়া হলে এঁটো কাপ প্লেট নিয়ে সে চলে যায়।

আরও ঘণ্টাখানেক বাদে সূর্য যখন পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু বাড়ি আর ঝাড়ালো বড় বড় গাছগুলোর আড়ালে নেমে গেছে, রোদ আর নেই, রাজানগরে সন্ধে নামার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে, সেই সময় ফোন বেজে ওঠে। সেটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে ভারী ধরনের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।—'আমি কি মেজর সত্যবান দত্তচৌধুরির সঙ্গে কথা বলছি?'

গলাটা মোটামুটি চেনা। কেননা রাজানগরের নানা জনসভায় সেটা অনেকবার শুনেছেন সত্যবান। ইনি জননেতা এবং স্থানীয় এম এল এ নবীনকিশোর সাহা।

পাবু যিশুরা অটো নিয়ে বেরিয়েছে দুপুরে। এত তাড়াতাড়ি যে তারপ্রতিক্রিয়া হবে, ভাবা যায় নি। স্নায়ুমণ্ডলীতে জোরালো একটা ঝাঁকি লাগে সত্যবানের। কিন্তু নবীনকিশোরকে তিনি তা বুঝতে দেন না। বললেন, 'হ্যাঁ, তার সঙ্গেই বলছেন। আমিই সত্যবান।'

নবীনকিশোর নিজের নামটা জানিয়ে বললেন, 'বিশেষ দরকারে আপনাকে বিরক্ত করছি।'

সত্যবান বললেন, 'বিরক্ত কী বলছেন! আপনি স্বনামধন্য জননেতা। আপনার ফোন পাওয়া তো সৌভাগ্যের ব্যাপার। অনুগ্রাহ করে দরকারের কথাটা বলুন—'

'আপনার সঙ্গে পার্সোনালি আমার পরিচয় নেই। তবে আপনার অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে আমি সবই জানি। আপনাদের অর্গানাইজেশন 'সুরক্ষা' খুব ভাল কাজ করছে। সে যাক, আজ দুপুর থেকে 'সুরক্ষা'র ছেলেরা রাজানগরের প্রতিটি পাড়ায় ঘুরে ঘুরে কে এক গাল-কাটা গাব্বা নামে অ্যান্টি-সোশালের নানা দুষ্কর্মের কথা জানাচ্ছে। তার সঙ্গে আমাকেও জড়াচ্ছে।'

'আপনার নাম কি বলেছে?'

'তা বলে নি। তবে ওদের প্রচার শুনে মনে হচ্ছে আমি গাব্বার পেছনে রয়েছি। বুঝতেই পারছেন, এটা আমার ইমেজের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। আফটার অল আমি এই অঞ্চলের জন-প্রতিনিধি। পিপল নিয়ে আমার কাজ। তা ছাড়া ইলেকশনের খুব দেরি নেই। এই সময় এরকম একটা প্রচার চালালে আমি ভীষণ বিপদে পড়ে যাব মেজর সাহেব।'

'আপনার দুর্ভাবনার কারণটা বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব দিন তো—'

'বলুন কী প্রশ্ন?'

'গাব্বারা যা করে বেড়াচ্ছে সেটা কি খুব সৎ কর্ম?'

একটু চুপ করে থাকার পর নবীনকিশোর বললেন, 'না, একেবারেই না।'

সত্যবান বললেন, 'এই উত্তরটাই আশা করেছিলাম। আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

নবীনকিশোর আগ্রহী হয়ে ওঠেন।—' হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন—'

'রাজানগর কনস্টিটিউয়েন্সির সবচেয়ে পাওয়ারফুল, সবচেয়ে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল নেতা আপনি। গাব্বার নোংরা অ্যাক্টিভিটি আপনি বন্ধ করুন। 'সুরক্ষা'র প্রচারও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ সাড়াশব্দ দিলেন না নবীনকিশোর। তারপর বললেন, 'অলরাইট, ইউ গেইন। গাব্বাদের ব্যাপারটা আমি দেখছি। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

লাইন ছেড়ে দেবার পর অন্য একটা চিন্তা আচমকা মাথায় ঢুকে যায় সত্যবানের। নির্বাচন ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছে বলে আপাতত গাব্বাদের না হয় থামিয়ে দেবেন। কিন্তু নির্বাচনে একবার জিতে বেরিয়ে এলে পাঁচ বছর নবীনকিশোরকে ধরা ছোঁয়া যাবে না। এদেশে ভোটাররা জন-প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনতে পারে না। তেমন আইনই নেই। গাব্বারা ফের দাপিয়ে বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে যাবে। তখন? ভাবতে ভাবতে সেই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার একটা উপায়ও পেয়ে যান সত্যবান।

সন্ধের পর পাবু যিশু তপুরা ফিরে এল। তা ছাড়া 'সুরক্ষা'র অন্য সব মেম্বাররাও জড়ো হল। সকলের চোখে মুখে অপার কৌতূহল।

পরমেশ ধর বললেন, 'ছেলেরা তো সারা দুপুর আর বিকেল রাজানগরের পাড়ায় পাড়ায় হানা দিয়ে গাব্বাদের নাম করে অজানা কোনও ক্রিমিনালকে হুমকি দিয়ে এল। তাতে সত্যিই কি কিছু কাজ হবে?'

সত্যবান ভুরু নাচাতে নাচাতে বললেন, 'হবে কি, হয়ে গেছে।'

অফিস ঘরে চমক খেলে যায়। সবাই সমস্বরে বলে ওঠে, 'হয়ে গেছে মানে?'

'চিতাবাঘটি ফাঁদে পা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।'

'কে তিনি।'

'নবীনকিশোর সাহা। এখানকার এম এল এ।'

'বলেন কী?'

নবীনকিশোরের সঙ্গে তাঁর যা যা কথা হয়েছে সমস্ত সবিস্তার জানিয়ে দিলেন সত্যবান।

'সুরক্ষা'র মেম্বাররা খুশিতে চেঁচিয়ে মেচিয়ে এক কান্ডই বাধিয়ে দেয়।—'

'এই ভিক্টরিটা আমাদের মেজর সাহেবের।'

সত্যবান বললেন, 'ভিক্টরিটা কারও একার নয়, 'সুরক্ষ'র হোল টিমের। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

সত্যবান তাঁর সংশয়ের কথাটা এবার জানালেন। ইলেকশনের কথা মাথায় রেখে কিছুদিনের জন্য গাব্বাদের নিশ্চয়ই খাঁচায় পুরে দেবেন নবীনকিশোর। কিন্তু নির্বাচনে জেতার পর যে পাঁচটা বছর হাতে পাবেন তিনি, তখন ফের খাঁচা থেকে বার করে দেবেন তাদের। ওরা লুটপাটের রাজত্ব চালিয়ে যাবে।

পরমেশ ধর বললেন, 'সেরকম সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। তা হলে কী করা দরকার?'

সত্যবান বললেন, 'আমি ডিসাইড করে ফেলেছি। এই ইলেকশনে আমি কনটেস্ট করব।'

'মানে?'

'গাব্বা, নবীনকিশোরদের মতো লোকেদের রুখতে গেলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পাওয়া দরকার। ওটা না পেলে এদেশে কিছুই করা যাবে না।'

নিশানাথ বললেন, 'আপনি কনটেস্ট করলে জিতে যাবেন ঠিকই। তবে—'

সত্যবান জিজ্ঞেস করেন, 'তবে কী?'

'একজন ইনডিভিজুয়ালের পক্ষে আমাদের সিস্টেমে ইলেকশনে জিতে কতটা কী করা সম্ভব, বুঝতে পারছি না।'

'প্রথম প্রথম কিছু করতে না পারলেও প্রতিবাদ তো করা যাবে। অ্যাসেম্বলিতে দাঁড়িয়ে পলিটিসিয়ানরা ক্যানসারের মতো কী ব্যাধি সারা সোসাইটিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেটা তো বলতে পারব। মিডিয়ায় সেসব বেরুবে। তার একটা বড় ইমপ্যাক্ট তৈরি হবে। আর—'

'আর কী?'

'আজকাল পলিটিকসে যা ইতরামো, অসভ্যতা, জুলুমবাজি আর নোংরামি ঢুকেছে, ব্যাপারটা চলে গেছে গান-ম্যানদের কব্জায়, তাতে পরিষ্কার ইমেজের শিক্ষিত লোকেরা এতে আসতে চায় না। আমাকে দেখে সেরকম অনেকেই হয়তো ভবিষ্যতে আসবে। রাজনীতি থেকে বদ রক্ত সরানো দরকার।'

এবার 'সুরক্ষা'র সবাই গলা মিলিয়ে সত্যবানের কথায় সায় দের।—'ঠিকই বলেছেন।'

রাত আটটার পর সকলে চলে গেলে বাড়িতে এসে দোতলায় উঠতে উঠতে সত্যবান ভাবছিলেন, দেশের সার্বভৌমত্ব, দেশের মর্যাদা রক্ষায় দু' দু'বার মরণপণ যুদ্ধ করেছেন। একবার বাংলাদেশ স্বাধীন হবার সময়, অন্যটা কার্গিলে। সে কি কতকগুলো ফেরেববাজ, লুটেরার হাতে ভারতবর্ষকে তুলে দেবার জন্য?

এবার রণক্ষেত্র বদলে গেছে। বাইরের শত্রুর সঙ্গে নয়, তাঁর নতুন যুদ্ধ নানা ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা দেশেরই একদল হিংস্র চিতার বিরুদ্ধে।